স্বপ্ন বদলে যায়

এবং

আরাফ

প্রভাস ভদ্র

স্বপ্ন বদলে যায়

এবং

আরাফ

প্রভাস ভদ্র

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

এক মলাটে ২টি উপন্যাস
স্বপ্ন বদলে যায়
এবং
আরাফ ৭৭

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা, ১৪২৫

প্রকাশক :
তুষার মজুমদার
সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৭

মুদ্রক :
বাণী আর্ট প্রেস
৫০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০০০৯
চলভাষ : ৯৩৩০৮৯৯৭২০
E-mail : baniartpress07@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা:
প্রভাস ভদ্র

মূল্য :
দেড়শো টাকা

ফরিদপুর সূত্রে
প্রিয় বোন আমার
জেসমিন আহমেদকে

লেখকের অসংখ্য গল্প

যে সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

গল্প

গল্পদশক

সমকালের গল্প

সময়ের কণ্ঠস্বর

স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

সিম্ফনী

নীল নীলা

অন্তত একজন

গল্প চল্লিশ

প্রাকৃতিক

উপন্যাস

দৃষ্টান্ত

স্বপ্ন বদলে যায়

"যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, হঠাৎ যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া— যাহারা কাছে আসিয়াছে, ভালোবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা শোক তাপ বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে.... তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়....।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদ্ধৃত।

নিবিষ্ট মনে বারবার পড়ছেন অতীন্দ্র।

কারণ আছে।

অতীন্দ্র এক সময় মনে করতেন, মানুষের জীবনে বঞ্চনা আঘাত দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি থাকা দরকার আছে। তা না হলে সুখের সঠিক স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়।

অথচ আশ্চর্য, কিছুক্ষণ আগে মানসিক অবসাদে এহেন অতীন্দ্রর মনে হয়েছিল, মৃত্যু অপার সৌন্দর্যময়। সুখকর নাহলেও শান্তিময়। তাই স্বেচ্ছা মৃত্যুই শ্রেয়। কিন্তু, মৃত্যুর স্বাদ যে কেমন তা অজ্ঞাত অজানা বলেই বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য সুস্বাদের পৃথিবী ছেড়ে যেতে ভয় পেয়েছেন।

আজ বাংলা নববর্ষ শুরু।

অতীন্দ্রর মনে প্রশ্ন, নবটা কোথায়? নতুন বছর কি সত্যিই নতুন কিছু নিয়ে আসে? পুরনো বছরের দেনা তো নতুনের খাতায় লেখা হয়। বিগত দিনগুলির তিক্ত বেদনাহত জীবনযাত্রা তো অব্যাহত। পুরনো বছরের অন্যায় অবিচার কলঙ্কিত কর্মতো ক্ষমার্হ নয় এ বছরেও।

"পুরনো সেই দিনের কথা সেকি ভোলা যায়...."

দূর থেকে ভেসে আসছে রবীন্দ্রসংগীত।

অতীন্দ্রর মনে পড়ে, পুরনো দিনের নববর্ষ। এখন সেসব কোথায়? বাংলা আর বাঙালিত্বই থাকছে না তো বাংলা নববর্ষ! কোথায় পাড়ায় পাড়ায় সেই রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব আর বিজয়া সম্মিলনী?

সব কিছু কত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে এখন। গতির তালে নিত্য বদলে যাওয়াই তো রীতি নীতি। কিন্তু পরিবর্তন মাত্রই তো প্রগতি না। সমাজ সংসার কর্মক্ষেত্র—সর্বত্র শুধুই দেহি দেহি। দিতে হবে দিতে হবে। শান্তি আসবে কোত্থেকে।

অতীন্দ্রর ছোটবেলায় এত বেশি চাওয়া ছিল না। একান্নবর্তী পরিবার। সবার

সম্মিলিত সন্তানের সংখ্যা ছিল অনেক। যেটুকু যা মিলত তাতেই ছিল বেজায় খুশি আনন্দ। আর এখন এক অথবা দুই সন্তানের সংসার—সময়ে? দশগুণ বেশি পাওয়াতেও ওরা খুশি বা তৃপ্ত না।

সেটাই স্বাভাবিক। অতীন্দ্রর মতে, মানুষ যা চায় তা পায় না। এই না পাওয়ার অপূর্ণতাতে পরম আনন্দ। মানুষ পায় না বলেই এত সুখি। পাওয়ার পরিণাম বিষাদময় অবসাদ আর আলস্যময় বৈচিত্র্যহীনতা। যে ফুল ফোটেনি তার আনন্দ মাধুর্যই বেশি। ফোটা ফুলের ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা উদ্বেগ। উৎসব শেষে করুণ সুর মূর্ছনার মতো।

এ সবই অতীন্দ্রর বেশি বয়সের ভাবনা। চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর অনেক অনেক সময় হাতে এসে যাওয়ার সুবাদে।

রিটায়ারমেন্টের আগে অতীন্দ্রর শুভাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার শর্মা জিগ্যেস করেছিলেন, কি করে সময় কাটাবেন ভেবেছেন?

এখনও ভাবিনি। অতীন্দ্র বলেছিলেন, প্রথম মাসটা বিলকুল রেস্ট। দ্বিতীয় মাসে চেন্নাই যাব মেয়ে জামাইয়ের কাছে। তৃতীয় মাসটায় ইচ্ছা আছে, লন্ডন থেকে ছেলে বৌমা আগ্রহ দেখালে যাব। চতুর্থ মাসে ভাবা যাবে সময় কাটাবো কেমন ভাবে। কিছু একটাতে নিজেকে এনগেজড্ রাখব তো বটেই।

আমার একটা সাজেশান বা রিকোয়েস্ট শুনবেন? ডাক্তার শর্মা বললেন।

অবশ্যই। বলুন শুনি।

আফটার রিটায়ারমেন্ট যা খুশি করুন। কিন্তু প্লীজ কোনো বুড়োদের আড্ডায় গিয়ে বসবেন না।

কেন?

যতদূর জানি, ওদের ওখানে কোনো উঁচু স্তরের আলোচনা হয় না। সত্যি বলতে কি, স্টেশন-প্লাটফর্ম লেক পার্ক ঝিলের ধারে গাছের তলায় বসে থাকা মুখগুলি আমার কেমন যেন করুণ করুণ লাগে। মায়া হয়, হয়তো অকারণেই। তাছাড়া, আমার মনে হয় ওদের দলে ভিড়লে খুব তাড়াতাড়ি আপনি বেশিরকম বুড়িয়ে যাবেন।

অতীন্দ্রর সিংহভাগ চাকরি জীবন কেটেছে বহির্বঙ্গে। বিভিন্ন জেলায়। সরকারি উচ্চপদস্থ আমলার কুর্সি ছেড়ে এসে এখন তো সাধারণ একজন। তাছাড়া, এতকাল পর ফিরে এসে পুরনো দিনের বন্ধুদের এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব কখনও! নাকি বিচ্ছিন্ন দূরত্বে থাকা উচিত?

লঘু হাসি ঠাট্টা রঙ্গ রসিকতা আর কেচ্ছা আলোচনা অতীন্দ্ররও ভালো লাগে না। তবু অন্যদের মতো সকাল বিকেল দু'বেলা নাহলেও মাঝে মধ্যে বসতেই হয় রেল সেতুর ওপর বাঁধানো জায়গার আড্ডায়। শুধুমাত্র বিকেলে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা অব্দি। বিজলি বাতির ব্যবস্থা আছে। তবু উঠে পড়তে হয় মশার উপদ্রবে।

তারপর যে যার বাড়ির দিকে রওনা হলেও কে কখন বাড়িতে ফেরেন অতীন্দ্র জানেন না। নিজে অন্তত তক্ষুনি ফেরেন না। কি করবেন ঘরে ফিরে? এই সময় থেকে টিভির রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা রাতের আহার অব্দি মণিমালার দখলে থাকে।

অতীন্দ্র যতটা সময় সম্ভব আশ্রম মন্দিরের দিকটা ঘুরে ফিরে কাটিয়ে ঘরে ফিরে আসেন।

মণিলালা প্রায় একমাস হতে চলল, চেন্নাই-এ মেয়ে জামাইয়ের কাছে গেছেন। ওখানে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। এখনকার জামাইরাতো আর আগেকার মতো না। এক একজন রেডিমেট পুত্র। প্রসব-পুত্রের চাইতেও ঢের বেশি নিকটতম। কেননা, আত্মজের অধিক আদর আপ্যায়ন দেখভাল করে থাকে যে।

জামাই জলাধিপতো মেঘ না চাইতেই জল এনে দেয়। ঈষিতার কাছ থেকে নিশ্চিত শুনে থাকবে। বাস্, আচমকা একদিন রীতিমতো চমক দিয়ে পছন্দের এক বোতল হুইস্কী এনে হাজির। দ্বিধাহীন বলল, থাকবেন তো বেশ কিছুদিন। ফুরিয়ে গেলে ফের এনে দেব।

জলাধিপের অনেক কিছুই অতীন্দ্রর বাড়াবাড়ি মনে হলেও মণিমালা কিন্তু বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। বরং বেশ খুশিই হয়ে থাকেন।

কারণ আছে।

আসলে একমাত্র পুত্র অনুভবকে আর কতটুকু কাছে পেলেন! অতীন্দ্রর বদলির চাকরি বলে সেই ছোটবেলা থেকে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো। প্রথম চাকরি দিল্লিতে। তারপর মুম্বাই। সবশেষে পাকাপাকি লন্ডনে। বিয়ে করতে এক মাসের জন্য এদেশে এসেছিল। পাশপোর্ট ভিসা ইত্যাদির জন্য বাধ্য হয়ে অংকিতাকে তিনমাস থেকে যেতে হয়েছিল। নাতনি রিমলিকে তো চোখেই দেখা হয়নি এখনও।

বেশ কিছু শূন্যতার জন্যই বোধহয় এতটা বেশি চেন্নাই যাওয়ার আগ্রহ উৎসাহ। ঈষিতা গর্ভবতী হওয়ার সময় থেকে এই চেন্নাই যাতায়াতটা বিস্তর বেড়েছে। এখন অবশ্য নাতি তাতা সবচাইতে বেশি টানছে।

অতীন্দ্র সবকিছুই বুঝতে পারেন। তবু মাঝে মধ্যে মণিমালার ওপর চাপা রাগ ক্ষোভ হয়। ভাবেন, এই বয়সে একা থাকা যে কি ভয়ঙ্কর তা যদি মণিমালা এতটুকু বুঝতো।

মণিমালা এখানে থাকলেও অতীন্দ্র কতটুকু কখন পেয়ে থাকেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে ওর দৈনন্দিন জীবন।

অপ্রয়োজনেই অন্ধকার ভোরে বিছানা ছাড়া অভ্যাস মণিমালার। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা। বার মাস। পাখির ডাকই এ্যালার্ম। একবার জাগলে আর ঘুম আসে না। জেগে বিছানায় শুয়ে থাকতে নাকি অসহ্য লাগে।

অতএব, প্রতিটি ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। একে একে জানলা দরজাগুলি খোলার শব্দ শোনা যায়। এফ এম থেকে গান বেরিয়ে আসে। এঘর সেঘর আর ছাদে কিছুটা সময় হাঁটাহাঁটি করে কাটে। পুজোর ফুল তুলে আনার পর ওভেনে চায়ের জল বসে। অতীন্দ্রর ডাক পড়ে।

নো বেড টি সিসটেম। অতীন্দ্রকে বিছানা ছাড়তেই হয়। একসঙ্গে বসে চা খাওয়ার সময় টুকটাক সামান্য কিছু কথাবার্তার পর মণিমালা ব্যস্ততা দেখান, ন্নাহ, উঠি। বেলা হয়ে যাচ্ছে। অনেক কাজ....।

অনেক কাজ বলতে সেই তো রোজকার মতো রাতের শয্যা তোলা। ঘর ঝাঁট দেয়া। পুজোর ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। কিছু পোশাক ধোওয়াধুয়ি করা। তারপর সাত সকালে স্নান সেরে পুজোর ঘরে। এক ঘন্টা পূজার্চনার পর রান্নাঘরে প্রবেশ। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে সব কাজ শেষ। বাকি যা কিছু দুপুরে কাজের মেয়েটি এসে করে দিয়ে যায়।

সকাল সাড়ে এগারটা থেকে মণিমালার হাতে রিমোট কন্ট্রোল। টিভি চলবে বিকেল অব্দি। ওরই মধ্যে দুপুরের খাওয়া দাওয়া আর টুকটাক কাজ। তাতে টিভি দেখার কোনো অসুবিধা হয় না। কেননা সেটি ডাইনিং রুমের এমন জায়গায় রাখা আছে যে, কপাটবিহীন রান্নাঘর থেকেও দেখা যায়।

মণিমালা কোনো কালেই দুপুরে ঘুমোতেন না। বই পড়ায় দারুণ নেশা ছিল। সাপ্তাহিকের গল্পগুলি ব্যস্ত অতীন্দ্র ওর মুখ থেকেই শুনে নিতেন। টিভি এসে মণিমালার পড়ার সময়টা কেড়ে নিয়েছে। অতীন্দ্ররও আর হালের লেখা গল্প শোনা হয় না।

ছুটির দিনে অতীন্দ্ররও দুপুরে ঘুমনো অভ্যাস ছিল না। এখন খাওয়া শেষ হতেই চোখের পাতায় ঘুমের আবেশ নেমে আসে। দিবানিদ্রা এড়াতে প্রথম দিকে চেষ্টার কসুর করেননি। সফল হননি।

অতীন্দ্রর দুপুরের ঘুমও ভাঙে মণিমালার ডাকে। বিকেলের চায়ের জন্য। এই সময়ের চা খাওয়া হয় ব্যালকনি অথবা ছাদে। সামান্য সময়টুকুতে ফের কিছু টুকটাক কথাবার্তা। মণিমালা ব্যস্ততা দেখানোর আগেই অতীন্দ্র উঠে পড়েন। সাজগোজ সেরে বেরিয়ে স্থির করেন, আজ কোথায় যাবেন।

রাত দশটার পর মণিমালা যেন আর জেগে থাকতে পারেন না। তবু ঢুলু ঢুলু চোখে টিভির সামনে বসে থাকেন। পাশে বসে অতীন্দ্র। কখন অতীন্দ্র বলবেন, শুতে যাচ্ছো না কেন? যাও ঘুমোয় গিয়ে।

নিরুত্তর মণিমালা রিমোট কন্ট্রোলটা অতীন্দ্রর হাতে দিয়ে ঘুমোতে যান।

হোক না এমনতর জীবন। তবু অতীন্দ্রর মনে হয় মণিমালার উপস্থিতিতে বাড়িটা তবুতো প্রাণবন্ত থাকে। পায়ে মল না পরলেও চোখ বুজেও বাড়ির ভেতর সর্বক্ষণ একজনের থাকা চলা ফেরা টের পাওয়া যায়। তাছাড়া, হোক না কথাবার্তা

কম। অতীন্দ্রর খুটিনাটি ত্রুটির অভাব তো নেই। শাসন গর্জনে ঘরগুলি গমগম করে তখন।

এই বয়সে এখন অতীন্দ্রর এসব মন্দ লাগে না। ভীষণভাবে ছোটবেলাকার মাকে মনে পড়ে যায়।

রাত্রে এতবড় বাড়িতে আজকাল একা থাকতে কেমন যেন ভয় করে অতীন্দ্রর। বয়সের ভয়। এই বয়সটাই তো নানা অসুখ বিসুখের। হঠাৎ যদি শারীরিক তেমন কিছু গোলযোগ দেখা দেয়। কিংবা বড় কিছু রোগ অসুখ। বুকে ব্যথা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট—এগুলিতো রাতের দিকেই বেশি হয় শোনা যায়।

তখন কি করবেন অতীন্দ্র। কাকে ফোনে ডাকবেন?

সতীন্দ্র, তপেন্দ্র নাকি অন্য কাউকে। বিপদে আপদে দশজনের সাহায্য সহযোগিতার ভরসাতেই তো এখানে বাড়ি করা। নৈলে মা মেয়ে ছেলে—কারও ইচ্ছে ছিল না ধ্যাড়্ধেড়ে গোবিন্দপুর এই মহেশতলায় বাড়ি তৈরি করতে।

পৃথক বাড়ি করা দরকার ছিল। কেননা, বংশবৃদ্ধি আর শরিকি ভাগবাটোয়ারায় পিতৃপুরুষের ভিটের ঠিকঠাক বাসযোগ্য জায়গা হচ্ছিল না। তাছাড়া, সময়ের সঙ্গে মানুষের রুচিও তো বদলায়। স্কুল বাড়ির আদলে সাবেকি বাড়িতে আধুনিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা থাকার কথা না। এছাড়াও প্রায় প্রতিটি মানুষেরই মনের মতন একটা বাড়ি তৈরির স্বপ্ন থাকেই। তাইতো হালে বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপন, 'আপনার বাড়ি হোক আপনার পরিচয়।'

সত্যিই বোধহয় তাই। এক সময় এ তল্লাটে অতীন্দ্রর মতো দৃষ্টিনন্দন বাড়ি দ্বিতীয়টি ছিল না। তাই দীর্ঘকাল ভিটে ছেড়ে বাইরে কাটানোর পর ফিরে এসে সবার নজর কাড়তে সময় লাগেনি। অতি অল্প দিনেই সকলের প্রিয় পরিচিত হয়ে উঠতে পেরেছেন।

শেষ বয়সের দিনগুলি কাটানো সম্পর্কে মানুষের ভাবনায় বোধহয় একটি বিষয়ে অনেকেরই মিল থাকে। সেটি হল, কর্মজীবন নিকট দূরে যেখানে যেমন কাটুক না কেন, মন চায় দিনের শেষের পাখিদের মতো আপন আবাসস্থলে ফিরতে।

স্বপ্ন থাকলেও সামর্থ্য থাকা চাই। নইলে কনিষ্ঠ ভাই তপেন্দ্রর মতো পৈতৃক বাড়ি আঁকড়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। মেজ নীরেন্দ্র ছোটবেলা থেকেই ভীষণ স্বার্থপর। এখানকার একান্নবর্তী পরিবার থেকে আলাদা থাকার সুবিধা ভোগ করতে স্বইচ্ছায় সেই যে কলকাতার অফিস ছেড়ে জামসেদপুর গেল, আর ফেরেনি। সেখানেই বাড়ি করে স্থায়ী বসবাস করছে। মা বাবা ভাই বোনদের প্রতি কোনো রকম দায়িত্ব কর্তব্য পালন না করায় প্রায় সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন এখন।

বড় দুই দাদার অনুপস্থিতিতে এখানে সতীন্দ্রই ছিল বড় ভাইয়ের মতো। যেমন

কার্যকরি সভাপতি সম্পাদক হয়ে থাকে। বাবা মারা যেতে হয়ে গিয়েছিল বাবার মতো। দায়িত্ব কর্তব্য ঝক্কি ঝামেলা কাঁধে অভিভাবকরা যেমনটি হয়ে থাকে।

হোস্টেলে থেকে পড়লে কি হবে অনুভব আর ঈষিতার সবরকম দেখভালতো করত সতীন্দ্রই।

শুধু কি তাই? জমি কিনে প্ল্যান পাশ করিয়ে দীর্ঘদিন দেখভাল করে একটা বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ করায় হ্যাপাতো কম না। অতীন্দ্রতো কিছুই করেননি। ঘামরক্ত ঝরিয়েছে সতীন্দ্র। তাইতো সতীন্দ্র বলে থাকে, একটা নয় দুটো বাড়ি করেছি আমি। নিজের বেলায় স্বপ্ন অনুযায়ী সামর্থ ছিল না। সেই স্বপ্ন সফল করতে পেরেছি দাদার বাড়ি তৈরি করে। ওই বাড়িটা কোনোও দিন বিক্রি হলে দাদার হয়তো কষ্ট হবে না, কিন্তু আমার হবে।

মাঝে নীরেন্দ্র থাকলেও সতীন্দ্রর সঙ্গে অতীন্দ্রর সম্পর্কটা ছিল বন্ধুর মতো। কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই বলেই অতীন্দ্র অনেককেই বলে থাকেন, সতীন্দ্র আমার শুধু ভাই না। ফ্রেন্ড ফিলোজফার লিগাল এ্যাডভাইসার—এভরিথিং।

অন্যদিকে সতীন্দ্র? বিয়ে করবে না ভেবেও করেছে অনেক দেরিতে। সন্তানও হয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর পরে। ছোট্টবেলা থেকেই অনুভবকে বলত, তুইতো আমার ছেলে। মরলে আগুন দিবি মুখে।

সেই সতীন্দ্রর সঙ্গে এখন আর সম্পর্কটা অতীন্দ্রর আগের মতো ঠিকঠাক নেই। যে কোনোও প্রয়োজনে ডাকলে আসে। সাহায্য সহযোগিতা করতে কসুর করে না। তবু নিজে থেকে আগেকার মতো যোগাযোগ রাখে না।

কারণ আছে।

অতীন্দ্রর মাঝে মাঝে মনে হয়, কিছু কিছু মানুষ থাকে যারা জন্ম থেকেই পরাধীন। প্রথমে বাবা মা, পরবর্তীকালে স্ত্রী এবং তৃতীয় পর্বে সন্তানদের কম বেশি ইচ্ছা নির্ভর চলতে অভ্যস্ত হতে হয়। নিজেও তেমনি একজন। নৈলে সতীন্দ্রর সঙ্গে শেষ বয়সে সম্পর্কটা অনুচিত ঢিলাঢালা সম্ভব ছিল না।

অনুভবতো বাবা মা-র সঙ্গেই তেমন যোগাযোগ রাখে না, তো কাকাদের সঙ্গে। হাইটেক একালের বস্তুবাদি ওরা ভাবতেই পারে না যে, সতীন্দ্র সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থে এত কিছু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। ঈষিতার যুক্তি, প্রতিটি কাজের পিছনে মানুষের দেয়া নেয়া জমা খরচের অংক থাকে। পরিবর্তিত প্রতিযোগিতার যুগে এছাড়া ঠিকঠাক বেঁচে থাকা যায় না। কাজেই ছোট্‌কাকে দোষ দেয়া যায় না।

সন্তানদের জন্ম হওয়ার পর থেকে মায়ের ভালোবাসা ক্রমশ পতি ছেড়ে সন্তানমুখি হয়ে পড়ে। ওদের বয়স যত বাড়ে মায়েদের মানসিক শক্তি বাড়তে থাকে। স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে যায় সন্তানদের ঘিরে। যে কোনোও বিতর্ক সিদ্ধান্তে পতি পরাজিত হতে থাকেন নিঃসঙ্গ একাকীত্বে।

সন্তানদের সঙ্গে সহমত মণিমালার বক্তব্য, বনবাস থেকে ফিরে আসার পর জ্যেষ্ঠর মর্যাদা-মুকুটতো এখন তোমারই প্রাপ্য। তাছাড়া, তোমার ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট বয়স বুদ্ধি হয়েছে। জামাই বৌমারও মতামত আছে। তবে কেন এখনও সেজ ঠাকুরপোর মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে?

অতীন্দ্র বুঝতে পারেন, রক্তসম্পর্ক বংশ মর্যাদা আত্মার আত্মীয় ইত্যাদি বিষয়গুলি ক্রমশ শব্দ বাক্যেই সীমাবদ্ধ হতে চলেছে। মানুষ আর আগেকার মতো মানুষকে ভালোবাসতে পারছে না বা শিখছে না। আপন-জনের উত্থান বিজয়ে গর্বসুখ আনন্দর পরিবর্তে ঈর্ষা করতে শিখছে। অন্যায় অপরাধ প্রচেষ্টায় একে অপরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইছে। সর্বত্রই শুধু হিংসা আর স্বার্থপরতা।

সবকিছু অতিদ্রুত কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। প্রতি ঘরে ঘরে।

সেদিন আড্ডায় বাল্যবন্ধু ভক্তিভূষণ বলছিল, আমরাই বোধহয় শেষ জেনারেশন যারা মা বাবা ভাইবোনদের প্রতি কর্তব্য করলাম।

শুনে যোগেশ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কত ভাইবোন ছিলাম আমরা। কতটুকুই বা সামর্থ ছিল সেই সময়কার বাবাদের। তবু যা পেতাম তাতেই দারুণ খুশি থাকতাম আমরা। পুজোয় একখানা পোশাকেই কি আনন্দ! আর এখন?

এখনতো মাত্র এক দুই পিস। ভক্তিভূষণ মন্তব্য জুড়ল, আমাদের চাইতে দশ বিশ ত্রিশ গুণ বেশি পেয়েও খুশি নয় কিছুতেই।

শুধু কি তাই? অতীন্দ্র নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন, আমার মতো অনেকেই আজকাল রিটায়ার লাইফে সন্তানদের রোজগারের ওপর নির্ভরশীল নয়। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে যা কিছু সঞ্চয় বিষয় আশয়—বিনা পরিশ্রমে ওরাই তো শেষমেশ পেয়ে যাবে। তবু—

ভাবাবেগে গলার স্বর আপ্লুত, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অব্যক্ত কথাটা অনুমানে উচ্চারণ করেছিল যোগেশ, তবু শুধুমাত্র একটু সম্মান সান্নিধ্য সেবা ভালোবাসা ওরা দেয়া দরকার মনে করে না!

অতীন্দ্রর মনে পড়ে যায়, ডাক্তার শর্মাকে রিটায়ারমেন্টের পর প্রথম তিন মাসের কি সূচি শুনিয়েছিলেন। অনুভবের তো অর্থকরি ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। অতীন্দ্রর যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। রিমলিকেতো ই-মেলে পাঠানো ফটোতে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। নাতি নাতনিদেরকে দেখতে কার না ইচ্ছে হয়। কিন্তু আজ অব্দি অনুভব ওরা ওদেরকে ওখানে যেতে ডাকলো কি?

মণিমালা প্রথম দিকে বলতেন, বাবা মাকে নেমন্তন্ন করতে হবে কেন? চলো না যাই দু'জনে।

এখন আর তেমনটি বলেন না। সম্ভবত নিজেও আস্তে আস্তে সব কিছুই বুঝতে পারছেন। আর সে জন্যই চেন্নাইকে আর দূর মনে হচ্ছে না।

।। দুই।।

চেনা চেনা লাগছে।

অতীন্দ্রর দিকে এগিয়ে এসে মধ্যবয়সী সুশ্রী রমণীটি বললেন।

অতীন্দ্র মাসের পেনশনের টাকা তুলতে এসেছেন।

বাড়ি থেকে ব্যাঙ্ক কাছে হলেও এ টি এম অনেকটা দূরে। তবু পায়ে পায়ে দূরে আসাই পছন্দ। দপ্তরের কর্মীদের অসহ্য উন্নাসিক ব্যবহার আর মেজাজি কথাবার্তার বালাই নেই। ভিড়ভাট্টা ঝুটঝামেলা বিহীন ঝটপট কাজ হাসিল। তাছাড়া, অদ্ভুত একটা মজাও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

অতীন্দ্র ছোটবেলায় অনেককেই বলতে শুনেছেন, টাকার গাছ আছে নাকি যে নাড়া দিলেই ঝরে পড়বে?

তো একালের এই যন্ত্রটাকে অতীন্দ্রর সে সময়ের উচ্চারিত সেই গাছের মতোই মনে হয়। একটু হিসেবের মধ্যে রাখলে সারা মাস নিশিদিন যখন খুশি নাড়া দিলেই টাকা বের হয়ে আসে। তাতেই অতীন্দ্র অবর্ণনীয় অদ্ভুত এক ধরণের আনন্দ পেয়ে থাকেন।

নজরে রমণীটির আপাদমস্তক জরিপ করে অতীন্দ্ররও চেনা চেনা লাগল। ঠিক স্মরণ করতে না পেরে নিজের সমস্যাটা জানালেন, অনেক সময় চেনা পরিচিত আপন আত্মীয়জনকেও আমি ঠিক চিনে উঠতে পারি না। এটা বোধহয় আমার এক ধরণের অসুখ। অনেকে ভুল বোঝেন।

কম বেশি অনেকেরই এমনটি হয়। রমণীটি স্নিগ্ধ হাসলেন, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর আপনাকে দেখে আমার মনেও দ্বিধা ছিল।

সম্ভবত এবার চিনতে পেরেছি। অতীন্দ্র ষোলআনা নিশ্চিত হয়ে তুমি সম্বোধনে বললেন, শোভনের বোন সেবন্তীতো?

অতীনদা তুমি ঠিক চিনেছো। সেবন্তী আবেগ আপ্লুত বললেন, কতকাল পর দেখা হল! এক্ষুনি বাড়ি ফেরার তাড়া নেইতো?

ন্নাহ্, কেন?

এক মিনিট অপেক্ষা কর। আগে টাকাটা তুলে আনি। তারপর কথা হবে। এতদিন পর পেয়েছি যখন অত সহজে ছাড়ছি না।

অতীন্দ্রর মনে হল, এই সেই সেবন্তী। কি অপূর্ব সুন্দরীই না ছিল! সেই সময়, যখন বন্ধুর বোন আর পাড়ার মেয়েদেরকে নিজের বোনই মনে করা হতো।

শোভনের মা হয়ে গিয়েছিলেন নিজের কাকিমার মতো।

অতীন্দ্রকে দারুণ ভালোবাসতেন দোলা কাকি। বিশ্বাস করতেন শোভনের চাইতেও বেশি। হরিশকাকা সাতে পাঁচে না থাকা সরল সোজা মানুষ ছিলেন। ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন সর্বক্ষণ। সাংসারিক সব কিছু সামাল দিতেন একা দোলাকাকি।

পারিবারিক সমস্যা কার না থাকে। দোলাকাকিদেরও ছিল। শলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া দেয়ার মানুষ ছিলেন না হরিশকাকা। দোলাকাকি শোভনের চাইতে অতীন্দ্রকেই বেশি যোগ্য মনে করতেন।

শোভন সেজন্য বিরূপ কিছুই মনে করত না। একদিন শুধু ঠাট্টা করে বলেছিল, তুই এত ঘন ঘন আসিস নাতো অতীন। তোর সবকিছুই নাকি আমার চাইতে ভালো।

নিজের ছেলেটাকে তুইতো দেখছি সতীনের ছেলে করে ছাড়বি।

প্রায় সব মায়েরাই এরকম হয়। অতীন্দ্র বুঝিয়ে বলেছিলেন, নিজের ছেলে যে সর্বক্ষণের। তাই অনেক কিছু ত্রুটি নজরে পড়ে। কেউ কি কখনও ঘরের পোশাক পরে বাইরে যায়? তেমনি কিছুক্ষণের উপস্থিতিতে শুধু ভালোটুকুই নজরে পড়ে।

সেবন্তী ফিরে এসে বললেন, অতীনদা আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে কলকাতায় যাব।

স্কুলে? তুমিতো স্কুলে পড়াতে শুনেছিলাম।

ঠিকই শুনেছো। দু'মাস হল রিটায়ার করেছি। টাকাকড়ি কিছুই পাইনি এখনোও। সে জন্যই যাব।

তাই? এত বয়স হয়ে গেল তোমার!

তোমার বুঝি হয়নি? সেবন্তী মুচকি হাসলেন। গাড়ির সুমুখ দরজা খুলে বললেন, নাও বসো।

তুমি নিজেই!

চালকের সীটে বসে সেবন্তী স্টিয়ারিং গিয়ারে হাত রাখতে অতীন্দ্র অবাক হলেন।

আগে ড্রাইভার ছিল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সেবন্তী বললেন, রিটায়ারমেন্টের পর দরকার হয় না, তাই ছেড়ে দিয়েছি। টুকটাক নিজেই চালিয়ে নেই।

কলকাতায় যাবে বললে। অতীন্দ্র কৌতূহলে জানতে চাইলেন, তুমি কি এখন এখানেই থাক?

বহু বছর হলো।

তোমাদের বাড়িটাতো আর নেই। প্রমোটারের থাবায় বিশাল বিল্ডিং উঠেছে। যেমনটি হয়ে থাকে। তুমিও কি একটা ফ্লাট পেয়েছো?

ন্নাহ্। অতীন্দ্রকে থামিয়ে দিয়ে সেবন্তী বললেন, আমাদের সময় তো বাপের সম্পত্তির ভাগ নেয়ার স্পৃহা বা ভাগ দেয়ার প্রচলন ছিল না। এখন এসব দুই সন্তানদের সময়ের ব্যাপার স্যাপার। তোমাদের বাড়ির বেলাতেও তো তাই।

ঠিকই বলেছো। আমাদের বোনেরা সবাই সচ্ছল না। তবু এদিক থেকে কোনোদিন কিছু চায়নি।

আমি কিন্তু তোমাদের বাড়ির সব খোঁজ খবরই রাখি।

তাই!

অবশ্যই। তুমি কিন্তু আমাদের সম্পর্কে কিছুই জান না। জানা দরকার মনে করতে না তাই। বিশাল অফিসার হয়ে গিয়েছিলে তো।

এটা তোমার ভুল ধারণা। চাকরি জীবনে খুউব কম আসতাম। তাও বিশেষ প্রয়োজনে দু'চার দিনের জন্য। আসলে আসা দরকারই হতো না! সতুই সবকিছু সামলে নিত তাই।

সে সব কিছুই জানি। সতুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। সতু আমাদের দুঃসময়ে অনেক রকমভাবে সাহায্য করেছে। সেই থেকে কৃতজ্ঞতায় আমিই যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি।

সতুতো আমাকে কোনোদিন কিচ্ছুটি জানায়নি!

ঠিকই করেছে। আমার মা কিন্তু দাদার চাইতেও তোমাকে বেশি ভালোবাসত, বিশ্বাস করত। অথচ, চাকরি পাওয়ার পর থেকেই তুমি আর কোনো যোগাযোগ রাখলে না।

মানছি। অতীন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, তোমাদের বাড়িতে যাওয়া কেন বন্ধ করেছিলাম তাতো তুমি জান না। জানলেও এতকাল পরেও এত রাগক্ষোভ থাকত না।

আমি জানি, কেন তুমি যাওয়া বন্ধ করেছিলে।

কি জান তুমি?

আমার জানাটা সত্যি হলেও তুমি স্বীকার করবে না। কাজেই বলব না।

কথা দিচ্ছি, অস্বীকার করব না।

একথা ঠিক যে, মা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসত। মনে প্রাণে চাইত, তোমার সঙ্গে আমার হৃদয়গত একটা কিছু হোক! সেটা তোমার মতো আমিও বেশ বুঝতে পারতাম। মা কিন্তু তোমাকে কোনোও দিনই আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিত না। অথচ, তুমি তেমনি কিছু আশঙ্কা করেছিলে। ভেবেছিলে, মার প্রস্তাব তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

ঠিক তাই। কেননা, আমাদের সময়টা ছিল মূল্যবোধের। তোমাদের সব ভাইবোনেরা আমাকে নিজের দাদার মতো মনে করত। শোভন, আমাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখত। কারও কাছে আমি নিজেকে ছোট করতে চাইনি।

আমিও তো বন্ধুদের হাসিঠাট্টা ইয়ার্কি কম শুনিনি। মাথা উঁচু করে গর্বের সঙ্গে বলেছি, অতীনদা আমার আর একটা দাদা। তার বেশি কিছু না। তাই বলে দুর্বলতা ছিল না বললে মিথ্যে বলা হবে। মূল্যবোধের শাসন দিয়েই সংযত করেছি। আমিই কি চাইতাম সবার কাছে নিজেকে ছোট করতে?

অতীন্দ্রর বাড়ির সামনে সেবন্তী গাড়ি থামালেন।

তোমরাওতো আমাদের মতোই অনেক ভাইবোন। কাকাতো আগেই মারা গিয়েছিলেন। কাকীমা মারা যাওয়ার সময় এখানে আসা না হলেও জরুরি কাজে কয়েকদিন কলকাতায় ছিলাম। সেখানেই সতুর কাছ থেকে শুনেছি।

জানি।

সে সময় কলকাতায় আছি জানতে তুমি!

অবাক হচ্ছো তো? সেবন্তী বাঁকা হাসলেন, মা সবসময় তোমার কথা বলত। আমার খুব খারাপ লাগত। তখনি ঠিক করেছিলাম, মা-র মৃত্যুসংবাদ তোমাকে কিছুতেই জানাব না। সেই সময় এখানে থাকলেও না।

কেন?

বেঁচে থাকতে যারা খোঁজখবর রাখে না অথচ মৃত্যুসংবাদ শুনলেই দুখি দুখি মুখে সাদ মালা নিয়ে হাজির হয়—সেই মানুষগুলিকে আমার অসহ্য লাগে।

কাকা কাকি ছাড়া বাকি সবাই ঠিকঠাক আছে তো? শোভন এখন কোথায়?

দাদার খবরটা সতু বোধহয় ইচ্ছে করেই তোমাকে বলেনি।

কি খবর?

সাত বছর আগে আচমকা একদিন হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছে। খুউব অশান্তিতে ছিল বৌদিকে নিয়ে। মা বলেছিল, তুই বরং বৌমাকে নিয়ে কোথাও আলাদা থাক। তাতে যদি শান্তি ফিরে আসে। মারা যাওয়ার অনেক আগে থেকেই আলাদা থাকত দাদা। সে অনেক কথা। সেই থেকে বিপদে আপদে সতুই তো সব ছিল।

আসবে একদিন আমার বাড়িতে? গাড়ি থেকে নেমে অপরাধীর মতো চোখ চেয়ে অতীন্দ্র বললেন, দু'জনেরই তো রিটায়ার লাইফ। সুখ দুঃখের গল্প করে কিছুটা সময় কাটানো যাবে।

আসতেই তো হবে একদিন। গাড়ির গিয়ার নেড়ে সেবন্তী বললেন, আমি কোথায় থাকি তুমি তো জান না। আগে আমি একদিন আসব। তারপর তোমাকে একদিন আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। শ্বশুর কুলের ইট ভাঁটার কাছেই নদীর ধারে সাবেকি বাড়ি। তবু তোমার ভালো লাগবে।

ফোন করে এসো। অতীন্দ্র একটা ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিয়ে বললেন, মোবাইল নম্বরেই ফোন করো। এখন তো আর নির্দিষ্ট রুটিন-জীবন নয়। কখন কোথায় থাকি।

বৌদি কেমনভাবে নেবে ভেবে দেখেছো তো?

এই বয়সে আবার ভাবাভাবির কি আছে। অতীন্দ্র ইচ্ছে করেই মণিমালার অনুপস্থিতি না জানিয়ে বললেন, ঘর বাড়ি ছেড়ে বাইরে প্রবাসে বাস করা মানুষ জনের মধ্যে এসব ভাবাভাবি খুবই কম। তাছাড়া, তোমার বৌদির মন মানসিকতা এমনিতেই একটু অন্যরকম। সাধারণের চাইতে ব্যতিক্রম। কি বলে জান?

কি?

বলে, বাইরের জগতে যার নিত্য কাজ তাকে ঘর থেকে নজরদারি কি করে সম্ভব? তাছাড়া নজরদারি করেও কাজের কাজ কিন্তু হয় না। সন্দেহ অবিশ্বাস করে কষ্ট পাওয়ার চাইতে বিশ্বাস করে শান্তিতে থাকা ঢের ভালো।

তাই!

অতীন্দ্র ঘরে ফিরে সুস্থির হতে পারলেন না। মনে হচ্ছিল, শেষ বয়সে এখানে না এলেই বোধহয় ভালো ছিল।

এতদিনে কত কিছুই তো বদলে গেছে। বিশেষ করে চেনা পরিচিতদের মুখের আদলগুলি। শেষ বয়সে ক'জনের শরীর স্বাস্থ্য সৌন্দর্য আগেকার মতো থাকে। মৃত্যু সংবাদ না জানি আরও কতজনের শুনতে হবে।

আগেকার সেই প্রকৃতি পরিবেশই বা কোথায়! ইট কংক্রিটের আকাশ ছোঁয়া বেঢপ বাড়িগুলির সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। গাছ-গাছালি পুকুর ডোবা ঝিল উধাও হয়ে যাচ্ছে। ছোটদের ছোটাছুটি আর খেলার জন্য খোলা জমিটুকু পর্যন্ত থাকছে না।

অথচ আশ্চর্য, এত কিছু অসুন্দরের মাঝেও এতকাল পর হঠাৎই আজ সেবন্তীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া, কিছু টুকটাক কথায় দারুণ ভালো লাগছে। এখনও।

এই বয়সে এ যেন দুর্লভ কিছু প্রাপ্তি মনে হচ্ছে।

আসলে এসব অনুভব অনুভূতি উপলব্ধির ব্যাপার।

মাঝে মাঝে অতীন্দ্রর মনে হয়, এগুলি মানুষের মন থেকে বোধহয় উবে যেতে বসেছে। নয়তো ভোঁতা অথবা অসাড় হয়ে পড়ছে। মানুষ তো প্রাণ খুলে হাসেই না আজকাল। হাসতেই জানে না। কাঁদতেই কি জানে? মরাকান্না বলে একটা কথা ছিল। পাড়ায় কারও ঘরে কেউ মরলে মরা কান্নাতেই ঘরে বসে টের পাওয়া যেত। কান্নার টানেই সবাই গিয়ে জড়ো হতো।

এখন শব্দ করে কাঁদতে মানুষ লজ্জা পায়। অথচ, সবতাতেই এখনকার মানুষেরা বেলজ্জতো বেশি। লোক জানাজানি কাগজে লেখালেখি আর বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যমে কত তো দুষ্কর্মের ছবি তুলে ধরা হয়। অপরাধীরা লজ্জা পায় কি?

অথচ লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণের সময়ে? উচ্চকিত মরা কান্নার সময় বিজ্ঞাপন ব্রেকের মতো কান্না বন্ধ। বিরতি সময়ের সংলাপে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে কত কিছুই জানা হয়ে যেত। প্রয়াত-র ধর্মকর্ম প্রেমপ্রীতি স্নেহ ভালোবাসার বৃত্তান্ত সব কিছু।

ছোটবেলা থেকেই অতীন্দ্র আত্মীয় অনাত্মীয় সকল জনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। দোলা কাকীরও।

একবার পূজোর ঠিক আগে দোলা কাকীকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। মেয়েলি অসুখে অপারেশনের জন্য। অতীন্দ্রর উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অন্ত ছিল না। সফল অপারেশনের পর যখন সাক্ষাতের জন্য বাধা নিষেধ উঠে গিয়েছিল, অতীন্দ্র

গিয়েছিলেন। হৃদয়গত নানা কথাবার্তার পর দোলা কাকী সেবন্তীকে কাছে ডেকে বললেন, ডাক্তার বলেছেন লক্ষ্মীপুজোর আগে আমার নাকি ছুটি হবে না। পুজোয় কত কাজ থাকে আমার।

লক্ষ্মীপুজো নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। সেবন্তী ভরসা দিয়ে বললেন, আমি কি এখনও কচি খুকি আছি নাকি। অন্যবার যেমনটি হয় এবারও তেমনিই হবে।

পুজোর আগে সারা বাড়ি ঝাড়পোচ ধোয়া মোছা?

সেসব কি তুমি একা কর নাকি। সবাই মিলে যেমন করা হয় তেমনি হবে। বরং তুমি থাকবে না বলে সবাই আরও বেশি ভালোভাবে হাত লাগাবে।

আর ওই যে নাড়ু মোয়া মিষ্টি নিমকি—বিজয়ার জন্য। নাড়ু করতে পারবি? অতীন নাড়ু, বড় ভালোবাসে রে।

কাকীমা আপনি থামুন তো। সেবন্তীর আগে অতীন্দ্রই ধমকের স্বরে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এসব আজেবাজে ভাবনার অর্থ হয় না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে এত বেশি চিন্তাভাবনায় মেতে থাকলে আপনার কিন্তু ছুটি পেতে আরও দেরি হয়ে যেতে পারে।

অতীন্দ্র ভালোবাসেন বলে নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে মায়ের কাছ থেকে পিঠে-পায়েস নাড়ু মোয়া আর রান্নাবান্না একমাত্র মণিমালাই শিখেছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাইরে বদলির চাকরি জীবনে সেটা সম্ভবও ছিল না। তা ছাড়া এখনকার ছেলেমেয়েদের ওসব প্রিয় জিনিস পছন্দ না। ওদের খাদ্য রুচিটা এখন অন্যরকম। মণিমালাতো ব্যতিক্রম মা না। কাজেই স্বামীর চাইতে সন্তানদের পছন্দের রান্না করতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এখন তো আবার ঈষিতার চাইতে জলাধিপের পছন্দের রান্না করতেই বেশি ভালোবাসেন।

উত্তরাধিকারসূত্রে অতীন্দ্রও কিন্তু ভালো রান্না করতে পারেন। আসলে ভোজন রসিক বলে শিখেছেন। আজকালতো অনেকের কপালেই চুনো মাছ নানা শাক মোচা থোড় শাপলা কচুরলতি এসব জোটেই না। অতীন্দ্র এনে কাটাকুটি করে নিজেই রান্না করেন। সুতরাং মণিমালা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ান না।

অতীন্দ্রর এই রান্না করতে পারাটা মণিমালার ঘন ঘন চেন্নাই যাওয়া আরও সহজ করে দিয়েছে।

অতীন্দ্ররও সুবিধা সুযোগ হয়েছে। এই বয়সের যেসব আহারে মণিমালার বাধা নিষেধ মানতে হয় সেগুলি অনায়াসেই খাওয়া চলছে। এই যেমন আজকে রান্না করেছেন মৌরলার ঝাল চচ্চড়ি ভেটকি মাছের কালিয়া নারকেলের ছোলার ডাল। রাত্রে আলুর পরটা হবে। এঁচোড়ের কোপ্তা কালকের রান্না আছে। আজও চলে যাবে।

মিষ্টি আর রেডমিট একদম এ্যালাও করেন না মণিমালা।

অতীন্দ্রর এখন নিরুচ্চার শ্লোগান, যা থাকবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে। অতএব এই সুযোগে মন যা চায় খেয়ে নাও।

অতীন্দ্রর বাবা মা যখন যেখানে মন চাইত—যেতেন থাকতেন। কিন্তু শরীরের শক্তি সামর্থ্য হারানো শেষের দিনগুলি সতীন্দ্রর কাছেই কাটিয়ে গেছেন।

ভোজন রসিক বাবার শরীরে তখন নানান ব্যাধি। উর্ধ্ব রক্তচাপ আর শর্করা বৃদ্ধির জন্য আহারে নানা বিধিনিষেধ। শারীরিক কষ্টের চাইতে মনের মতো খেতে না পারার কষ্টটা ছিল শতগুণ বেশি।

সতীন্দ্র একদিন বলেছিল, বাবা তোমার মনের আসল কষ্টটা আমি বুঝি। একই টেবিলে খেতে বসে আমার খুব খারাপ লাগে। কষ্টও হয়। তাই বলছিলাম, যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমার। এভাবে কষ্ট পাওয়ার চাইতে মন যা খুশি খেয়ে যাও। তাতে যদি ক'বছর কম বাঁচো তাতে আমার কষ্ট কম হবে।

বলছিস!

আনন্দ খুশিতে অদ্ভুত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি বাবার চোখ।

সেই থেকে মন যা চায় খেয়ে তিরানব্বই বছর অব্দি বেঁচেছিলেন।

মা-র মৃত্যুকালীন বয়সও ওই তিরানব্বই। শেষ বয়সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে কারণে মানুষ আচমকা পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙে, মা-র ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। বেশি বয়সের অশক্ত পা দুটো বিশাল ওজনের শরীরকে বহন করতে পারছিল না। ফলশ্রুতি, দু'পা ভাঙায় ট্রাকশান নিতে হয়েছিল। ট্রাকশানের ওজন সহ্য করতে না পারায় হার্ট এ্যাটাক হয়। প্রাণ বাঁচাতে ট্রাকশান খুলে দিতে হয়েছিল।

সেই থেকে পঙ্গু হয়ে বিছানায় সব কিছু। এদিকে বুকে পেশমেকার।

শেষ দশটি বছর মা-র কিন্তু অন্য কোনো রোগভোগ ছিল না। সর্বক্ষণের পরিচারিকা মেয়েটির সঙ্গে হয়ে গিয়েছিল দিদা নাতনির সম্পর্ক। হাসি মস্করায় কেউ কম যেত না।

একটি মানুষের জীবনে যদি আহার নিদ্রা আর বর্জ্য নিষ্ক্রমণ স্বাভাবিক থাকে তো তার চাইতে সুখী জন আর কে হয়!

মা সর্বদিক থেকেই বেশ সুখ শান্তিতেই ছিলেন। চোখ মুখ চেহারা দেখে তা সহজেই মালুম হতো।

শেষের দিকে হজমশক্তি কমে গিয়েছিল মা-র। হঠাৎ হঠাৎ পেট খারাপ হতো। তখনই একদিন আবিষ্কার করা গিয়েছিল মা সর্বক্ষণের সঙ্গিনী নাতনিকে দিয়ে জর্দা আনিয়ে লুকিয়ে রাখেন।

নিত্য পান খাওয়া অভ্যাস ছিল মা-র। জর্দা ছাড়া পানে মৌজ হয় কখনও। ব্যস্ মা-র খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিস্তর অভিযোগ। হররোজ।

নবনীতা বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইল।

ডাক্তার বোঝালেন, দিদিমা আপনি কিন্তু জর্দা একদম খাবেন না। কথা না শুনলে ভীষণ বিপদে পড়বেন।

সতীন্দ্র ভাবল এই বয়সে কি আর এমন বিপদ হবে? বাঁচবেনই বা আর ক'দিন। বিছানায় শুয়ে কিই বা আছে জীবনে। একটা মানুষ যে চলাফেরা করতে পারে না। মনের মতো পোশাক পরতে পারে না। মন চাইলেও কোথাও যেতে পারে না। এমনকি বাইরের প্রকৃতি থেকেও বিচ্ছিন্ন বঞ্চিত হয়ে খাঁচায় বন্দিজীবন। ওঁর বেঁচে থাকাতো এখন শুধুমাত্র একটু ভালোমন্দ আহার-আনন্দর জন্য।

সতীন্দ্র একদিন মা-কে বোঝাল, আমি তোমাকে কোনো খাবার থেকে বঞ্চিত করতে চাই না মা। মন যা চায় তুমি খাবে। এমনকি জর্দা খেতেও যদি মন চায় এবার থেকে লুকিয়ে আনতে হবে না। যা কিছু খেতে ইচ্ছা বললে আমিই এনে দেব। কিন্তু মনে রাখবে, অনিয়মে কোনো কষ্ট যদি পাও—সেটা শুধু নিজের জন্যই।

অতীন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন, সেদিন মা-র মুখটাও বহুকাল আগে খাওয়ার ওপর বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ার পর বাবার মুখের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। হয়তো বা মা সেদিন সতীন্দ্রকে আশীর্বাদও করেছিলেন।

দুপুরে খেতে বসার আগে মণিমালার ফোন এলো।

রোজকার মতো জানতে চাইলেন, দুপুরে কি মেনু আজ।

অতীন্দ্র মনগড়া তালিকা শোনালেন, মণিমালাকে আশ্বস্ত করার জন্য যেমনটি রোজ করে থাকেন।

মণিমালা যথারীতি অভিভাবকসুলভ কিছু পরামর্শ দিলেন। বাড়ি ঘরদোর বাগানের খুঁটিনাটি খোঁজ নিলেন। এমনকি কাজের মাসি ঠিকঠাক আসে কিনা সেটা জেনে নিতে ভুল করেন না।

অতীন্দ্রর আশ্চর্য লাগে, একটি বারের জন্যও মণিমালার প্রশ্ন নয়, কেমন আছো তুমি? আমি না থাকায় কষ্ট হচ্ছে কি?

জিগ্যেস করলে অতীন্দ্র মনগড়া খুশি করা জবাব দিতেন কিনা জানেন না। দেখলে কারও মনে হয় না যে, মনে কোনো দুঃখ আছে। কিন্তু বাস্তব সত্যটা হল, নিঃসঙ্গ একাকীত্বের যন্ত্রণায় প্রতীক্ষায় থাকেন, কখন মণিমালার ফোন আসবে।

বাইরে থাকলে বোধহয় সবাই খুউব হিসেবি হয়ে থাকে। তা নাহলে মণিমালা এত যে ফোন করে মেয়ে জামাই দু'চার কথা বলে না কেন? নিশ্চিত খরচ বাঁচানোর জন্য।

অনুভব ওরাও তো তাই। পাক্ষিক একবার ফোন করা অভ্যেস। মণিমালা চেন্নাই থাকলে মাসে একবার বাবা, একবার মাকে। হিসেবটা ঠিকঠাক থাকে।

হিসেব হিসেব হিসেব। হিসেবি জীবনে আনন্দ কোথায়? অতীন্দ্র মনে করেন,

ধার দেনায় ডুবে থাকা উচিত নয় ঠিকই। কিন্তু ভালো কাজে দেনা তো করতেই হয়। লেখাপড়ার জন্য দেনা করা কি অনুচিত। নাকি চিকিৎসা বিবাহ আর বিপদ আপদে?

অতীন্দ্রর মতে, মানুষকে চেনা যায়, হিসেব আর বেহিসেবি জীবনযাপন দেখে। অন্য যে যাই বলুক অতীন্দ্র জানেন, সতীন্দ্র জীবনভর যা করেছে বেহিসেবি মতে। উচ্ছৃঙ্খল উড়িয়ে দেয়া বলতে যা বোঝায় তাতে নয়। উদার হৃদয়ের তাগিদে।

অনুভব আর ঈষিতার জন্যও দেদার খরচ করত সতীন্দ্র। ছুটি কাটাতে কিংবা পরীক্ষার পর অবকাশ কাটাতে ওরা এখানে কাকার কাছে আসাই পছন্দ করত। সে সময় ওদের কোনো অসুখ বিসুখ হলে খরচ করত সতীন্দ্র। পরে কিছুতেই অতীন্দ্রর কাছ থেকে সে টাকা নিত না। এখানে থাকা কালে ওদের জন্মদিন পড়লে বাবা মা-র অনুপস্থিতির আঁচ লাগত না।

সেবার অতীন্দ্র তখন ভুবনেশ্বরে পোস্টিং। মাইল্ড স্ট্রোকে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন। খবর পেয়ে রাতের ট্রেন ধরে সতীন্দ্র হাজির। সঙ্গে অনুভব। মণিমালা নিশ্চিন্ত হয়ে বলছিলেন, আর আমার কোনো চিন্তা নেই।

পরম নির্ভরযোগ্য ছিল সতীন্দ্র। অনুভবের কলেজ কামাই অনুচিত মনে করে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল দু'দিন পর। নিজে থেকে গিয়েছিল নার্সিংহোম থেকে ছুটি না পাওয়া অব্দি।

তারপর প্রতি শনিবার ছুটির পর ট্রেন ধরত ভুবনেশ্বর যাওয়ার। সোমবার অফিস করে নিজের বাড়িতে ফিরত। দু'মাস।

ভুবনেশ্বর থাকাকালে অনেক সময় বাজার করে আনত সতীন্দ্র। মণিমালাতো পারতপক্ষে কিছু কিনতেই দিত না—সতীন্দ্র টাকা নেবে না বলে।

অতীন্দ্রর সেই বন্ধুতুল্য প্রিয় ভাইয়ের পক্ষে সম্পর্ক ঢিলেঢালা হওয়ার প্রধান কারণই মণিমালা। ওদের নিরন্তর জমা খরচ লাভ লোকসানের হিসেব নিকেশি জীবন।

এই বাড়ির গাছপালা দেখভাল করত সতীন্দ্র। নারকেল ওর প্রিয় হলে কি হবে হিসেবের বাইরে একটিও দিত না মণিমালা।

অভাব না থাকলে কি হবে, লোহালক্কড় বোতল শিশি ইত্যাদি তো বিক্রি করা গৃহিণীদের অভ্যেস। এখন পুরনো কাপড়ের বদলে রদ্দি প্ল্যাস্টিক দ্রব্যও রাখে অনেক।

মণিমালা তেমনি গাছের উদ্বৃত্ত ফল বিক্রি করেন।

।। তিন।।

এই বয়সে স্মৃতি বোধহয় সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। বিশেষত মানুষ যখন নিঃসঙ্গ একাকী। এ সময় চুপচাপ শুয়ে বসে ইচ্ছে মতো শৈশব কৈশোর যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে যাওয়া যায়। স্মৃতিচারণের এই সময়টুকু বড়ই মধুময়।

এখনকার মতো তখন জন্মতারিখ দেখে স্কুলে ভর্তি করা হতো না। হাতেখড়ির পর বেশ কয়েকটি বছর প্রায় সবাইকেই বাড়িতে বসে প্রাথমিক পড়াশুনো করতে হতো। অভিভাবকদের বিচারে উপযুক্ত সময়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার রেওয়াজ ছিল।

কাজেই, তখন বয়স কত ছিল বলা মুশকিল।

অতীন্দ্রর স্পষ্ট মনে পড়ছে, বাবার সঙ্গে স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলেন। পরনে ছিল ইজের প্যান্ট।

অতি সাধারণ সাদামাটা স্কুল। তবে পাকা বিশাল বাড়ি।

গুরুজন হেডমাস্টার মশাই কিন্তু এতটুকু গুরুগম্ভীর ছিলেন না। হাসিমুখে নাম ধাম বাবার নাম জিগ্যেস করলেন। জানতে চাইলেন, বাড়িতে আর কে কে আছে আছেন। যে বইগুলি পড়তে হচ্ছে সেগুলির নাম কি? কি কি অংক করতে পার ইত্যাদি সামান্য কিছু প্রশ্ন।

ব্যস, তিন ক্লাসে ভর্তির জন্য তক্ষুনি মনোনীত হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট অতীন্দ্র। ভর্তিও হয়েছিল সেদিনই।

পরবর্তীকালে অন্য তিন ভাইকে একই স্কুলে ভর্তি করাতে বাবার আর যাওয়া দরকার হয়নি। একা অতীন্দ্রই যথেষ্ট।

তারপর একে একে স্কুল পেরিয়ে কলেজ ইউনিভার্সিটি। অথবা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসা। ভিন্নতর চাকরিসূত্রে নিকট-দূরে ছড়িয়ে পড়া।

ব্যতিক্রম একমাত্র তপেন্দ্র।

পড়াশুনোয় একদম মন ছিল না তপেন্দ্রর। ছোট বোনরা পর্যন্ত স্কুল পেরিয়ে কলেজ পড়তে গেলে কি হবে, তবু সেই স্কুলেই থেকে যায়।

শেষমেশ স্কুলের শেষ ক্লাস পাশ করলেও তপু আর কলেজে পড়তে চাইল না। ওর স্পষ্ট কথা, সবার দ্বারা সব কিছু হয় না। আমার দ্বারা আর লেখাপড়া করা অসম্ভব।

অতীন্দ্র নীরেন্দ্র তখন বাড়ি ছেড়ে চাকরিক্ষেত্রে। নানা কারণে বাবা ক্রমশ সংসার সম্পর্কে কিছুটা নিস্পৃহ। স্বভাবতই সতীন্দ্রই কার্যত এক নম্বর কার্যকরি গার্জেন।

সতীন্দ্র অনেক রকমভাবে বুঝিয়েও শেষ পর্যন্ত তপুকে আরও পড়াশুনো করতে রাজি করাতে পারেনি।

তো বেশ চড়েবড়ে খাচ্ছিল। কোনো ভাবনা চিন্তার বালাই ছিল না। থাক না বাবার বিষনজরে, অসুবিধা কিসের যেখানে মা-র প্রশ্রয় সাহায্যে সহযোগিতার হাত খোলা আছে। কনিষ্ঠদের প্রতি মায়েদের যেরকম দুর্বলতা থাকে আর কি।

সম্পূর্ণ গৃহবধূ মা-র সক্ষমতা বলতে তো বাবার টাকাকড়ি। বাবা না দিলেও মা-র মাধ্যমে তপুর পকেটে হাতখরচ ঠিকই পৌঁছে যেত।

এসব মজা অবশ্য খুউব বেশি দিনের নয়।

হঠাৎই বাবা মারা যেতে তপু কিন্তু সবচাইতে বড় দু'দাদার পরিবর্তে সতীন্দ্রকেই জড়িয়ে ধরে আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল।

বুকভাসি চোখের জলে কেঁদে বলল, বাবা চলে গেল। আমার যে কি হবে।

অতীন্দ্র অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, নির্ভেজাল আন্তরিক স্নেহে তপুর চুলে হাত বোলাচ্ছে সতু। বার বার বোঝাচ্ছে, অত ভাবছিস কেন? বাবা কি কারও চিরকাল বেঁচে থাকে নাকি! আমি তো আছি।

অতীন্দ্রর বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি, সতু কেন একবারের জন্যও তপুকে বলছে না যে, আমরা দাদারা তো আছি।

এই 'আমিতো আছি' সেকেলে ভরসা সান্ত্বনার সংলাপটা কিছুদিন আগেও উঠতে বসতে সবতাতেই সতীন্দ্রর ঠোঁটে সর্বক্ষণ লেগে থাকত। ইদানিং যথেষ্ট সংযত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আদতে সংলাপটা বাবার কাছ থেকে পাওয়া বা নেয়া। শুধুমাত্র কথার কথা মুখে বলেই খালাস না। বাবার মতো মুখের কথা কাজে করতে চেষ্টার কসুর করে না।

এখন অনেকের কাছেই এসব হল, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ব্যাপার। বিশেষত ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষজনের বিচারে।

সতীন্দ্র যদি অন্যদের মতো শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকত তাহলে তপেন্দ্রর বেঁচে থাকাই মুশকিল হতো।

তপেন্দ্রকে আত্মনির্ভর প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে কি করেনি সতীন্দ্র!

নিজের টাকার একের পর এক ভিন্নতর ব্যবসায় নামিয়েছে। কোনোটাতেই তপেন্দ্র লাভের মুখ দেখাতে পারেনি। ধৈর্য হারিয়ে অস্থির চিত্তে একদিন বেলজ্জ বলেছে, ব্যবসা ট্যাবসা আমার দ্বারা হবে না।

ব্যবসা যে তপেন্দ্রর দ্বারা হবে না সেটা সতীন্দ্রও বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। ততদিনে বিরাট অংকের মূলধনের জলাঞ্জলি হয়ে গেছে।

তপেন্দ্র মূলধন লাভ লোকসান ইত্যাদি কিছুই বোঝে না। ওর কাছে ঝুঁকিবিহীন দশটা পাঁচটার চাকরিই আকর্ষণীয়।

কিন্তু, চাকরি পাওয়া কি অতই সহজ।

হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারদের দেশে তপেন্দ্রর যোগ্যতা বড়জোর শ্রমিকের কাজ পাওয়া সম্ভব। নয়তো এমন কাজ যেখানে কোনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার থাকবে না। নির্ধারিত কাজের সময় সেটা মুখের কথাতেই কাজে যোগদান অনুমোদন। আবার মুখের কথাতেই হঠাৎ একদিন কাল থেকে অপনাকে আর দরকার নেই।'

কত জায়গাতেই তো তপেন্দ্রকে কাজে ঢোকানো হয়েছিল। কোনো কাজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি।

অথচ, এরই মধ্যে আবার ভালোবাসাবাসি।

একালের মেয়েরাও বড় অদ্ভুত। কি দেখে যে তপেন্দ্রর মতো ছেলেদের প্রেমে পড়ে কে জানে।

একটা সময় ছিল যখন প্রধানত ছেলেরাই কোনো মেয়ের দিকে এগিয়ে যেত। এখন হয়েছে উল্টো। পছন্দের ছেলে দেখলে মেয়ের মা বাবারাও টোপ ফেলতে দ্বিধা করে না।

তপেন্দ্রর ক্ষেত্রে অবশ্য এসব কিছু ছিল না। আকর্ষণীয় ওর চেহারাটাই স্নিগ্ধাকে কাছে টানতে সাহায্য করেছে।

গরীব পুরোহিত কন্যা স্নিগ্ধা। অতীন্দ্রদের পৈতৃক বাড়ি আর পারিবারিক পরিচয়তো ওর পক্ষে যথেষ্টই।

সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তপেন্দ্রর বলা নানান বর্ণালি লোভনীয় গুলগপ্প যা সহজেই যে কোনো মেয়েকে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে।

আসল অপরাধী যে তপেন্দ্র সেটা বোঝা গিয়েছিল ওদের বিয়ের পরে। স্নিগ্ধা বুঝলেও তখন আর কিছু করার ছিল না।

এখন অবশ্য তপেন্দ্র ওরা ভালোই আছে। একমাত্র কন্যা কঙ্কনা ভালো স্কুলে পড়ে। ফোন ফ্রিজ টিভি ইত্যাদি সব কিছুই আছে।

তবে সবকিছুর মূলে স্নিগ্ধা। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে বড় হয়ে ওঠা বলেই বোধহয় স্নিগ্ধা সংসারের হাল ফেরাতে নিজে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় নামতে দ্বিধা করেনি।

স্নিগ্ধার পক্ষে সবকিছুর হাল ধরা সহজ ছিল না। যদি না সতীন্দ্র ওই সময় আলাদা বাড়ি তৈরি করে উঠে যেত।

তপেন্দ্র জুতা কারখানায় জঙ্গী ঝাণ্ডাবাজির ইউনিয়ন করত। বিদেশি কোম্পানী বলেই তখনও ভেঙে পড়েনি। কারখানার কাজে গাফিলতির দায়ে তপেন্দ্র তখন বরখাস্ত বেকার। তবু প্রতিক্রিয়াহীন। আগের মতো আবার সেই মনের সুখে খায় দায়। তবে এবার চড়ে বড়ে বেড়ানোর বদলে পার্টির কাজ করে। রাত্রে নিশ্চিন্তে নাক ডেকে ঘুমায়।

কে বলবে স্নিগ্ধার গর্ভে ওর সন্তান প্রয়োজনীয় খাদ্য চাইছে।

স্নিগ্ধার কিন্তু আত্মসম্মান বোধ অতি প্রখর।

তপেন্দ্রর নিষ্কর্মা বসে বসে খাওয়া স্নিগ্ধা ভীষণভাবে অপছন্দ করত। সেই সঙ্গে গর্ভবর্তী নিজেও যুক্ত একজন বলে লজ্জা পেত। এই নিয়ে দু'জনে খিটিমিটি লেগেই থাকত। সবসময় খিটিমিটিতে সীমাবদ্ধ থাকত না। বেলজ্জ বোকা বোকা জবাব শুনে স্নিগ্ধা অনেক সময় মেজাজ হারিয়ে ফেলত। উত্তেজনায় অপ্রিয় হলেও অনেক কিছু যথার্থ মন্তব্যও করত। বিশেষত তপেন্দ্রর কামচোর অলস জীবন নিয়ে।

একদিনতো উচ্চকিত কণ্ঠে বলেই ফেলল, কিসের পুরুষ তুমি! তুমিতো একজন

গ্র্যাজুয়েটও না। ওই ডিগ্রিটি আমার আছে। তবু তোমার মতো ছুৎমার্গে নিষ্কর্মা বসে থাকতাম না। কোনো কাজ না পেলে বাজারে সব্জি বেচতে বসে যেতাম।

তপেন্দ্রর আচরণে স্নিগ্ধা নিজে কিছু একটা করবার কথা ভাবত। রোজকারের নিত্য নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অনুমোদনের জন্য অতীন্দ্রর কাছে হাজির হতো।

অধিকাংশ পরিকল্পনাই দরজায় দরজায় ফিরি করা সংক্রান্ত।

সতীন্দ্র আবার সেসব অতীন্দ্রকে জানাত।

মতৈক্যের অনুমোদন না মিললেও একটা বিষয়ে দুজনেরই সহমত ছিল। সেটা হল, তবু হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে। পার্টি করে বেড়াবে। আর ঘরের অন্তঃসত্ত্বা বউ ফিরি করে বেচতে দরজায় দরজায় ঘুরবে! দৃষ্টিকটু লাগবে না? কারও কাছে মুখ দেখানো যাবে নাকি।

তাছাড়া, অলস নিষ্কর্মা তপেন্দ্রর তো তাতেও লজ্জা হবে না। বোধহয় হওয়া তো দূরের কথা। বরং আহ্লাদে আটখানাই হবে। নিজের মগজ থেকে কিছু কাজকর্ম করে রোজগারের চিন্তা একেবারেই ধুয়ে মুছে ফেলবে।

তপেন্দ্রর মেয়ের তখন একবছর বয়স।

ইউনিয়ন হাজার চেষ্টাতেও ফের জুতা কারখানার কাজ ফিরিয়ে দিতে পারেনি। বাধ্য হয়ে তপেন্দ্র একটা কাপড়ের এম্পোরিয়াম সেলস্ কাউন্টারে কাজ করছে।

সতীন্দ্র একদিন ডেকে বলল, আমার বাড়ি তৈরি শেষ হতে আর বড়জোর দেড় দু'মাস লাগবে। এরপর বড়দার বাড়ি তৈরি শুরু হবে। মেজদাতো জামসেদপুরে বাড়ি করেছে। কাজেই আমি চলে যাওয়ার পর বাড়তি ঘরগুলি অনায়াসেই ভাড়া দিতে পারিস। তারপরও প্রয়োজনে অমিতো থাকছিই। কিন্তু কথা হল, আমার অনুপস্থিতিতে এবার থেকে যথার্থ স্বামী আর বাবা হয়ে উঠতে হবে। এটা খুবই জরুরি।

তপেন্দ্রর চোখ মুখ সেদিন আশ্চর্যরকম বিষণ্ণতায় ভরেছিল।

কিন্তু স্নিগ্ধা ছিল উজ্জ্বল খুশি ঝলমল। সম্ভবত পরাধীনতা থেকে মুক্তির দিন আগত—সেই আনন্দে।

সেই সঙ্গে দেখা স্বপ্নে, এবার নিশ্চিত তপেন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে হাতের মুঠোয় পাওয়া সম্ভব হবে। মনের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে আর কোনো অসুবিধাই থাকবে না।

একথা অনস্বীকার্য যে, স্নিগ্ধা অসীম ধৈর্য আর অক্লান্ত নিষ্ঠায় তপেন্দ্রকে আশ্চর্যরকম বদলাতে পেরেছে। জন্ম থেকে শত চেষ্টাতেও যা অন্য কারও দ্বারা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

তপেন্দ্র নিজেও বুঝতে পেরেছে। সেজন্য সকৃতজ্ঞ সগর্ব প্রচার করে, আমার

যা কিছু পরিবর্তন উন্নতি সব কিছুর মূলেইতো কণার মা। ওর জন্যই আমি বেঁচে আছি।

এখানেই সতীন্দ্রর রাগ ক্ষোভ অভিমান। ওর প্রশ্ন, শুধুমাত্র স্নিগ্ধার জন্য। তাহলে কি 'আমিতো আছি' শুধুই কথার কথা?

অতীন্দ্র বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারেন, তপেন্দ্রর মন মানসিকতা কোন পর্যায় পৌঁছালে এমনতর কথা বলে থাকে। আসলে সব মানুষই যেমন চরিত্রগত দিক থেকে যথার্থ মানুষ না, তেমনি আবার অনেকে সত্যিকার পুরুষও না।

তপেন্দ্রকে শেষোক্তদের দলে ফেলা যায়।

অনুভবকেও একদিন সত্যিকার পুরুষ মনে না হওয়ার কথা বলেছিলেন অতীন্দ্র। ওর স্কুল জীবনের শেষের দিকের সময়ে।

শুনে ভয় পেয়েছিল মণিমালা। আগডুম বাগডুম পাঁচ রকম ভেবে জানতে চাইল অতীন্দ্র বাবা হয়ে কেন এমন বলছে। অশুভ আশঙ্কায় কান্নাকাটির একশা।

অতীন্দ্র বোঝালেন, বৃথাই কু-ভাবনা।

তাহলে পুরুষ মনে না-হওয়ার কারণ কি? মণিমালার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আমাদের ছেলে সাঁতার জানে? অতীন্দ্র জিগ্যেস করলেন।

না।

সাইকেল চালাতে?

না।

গাছে উঠতে?

না।

আজ পর্যন্ত কোনো খেলাধুলো করেছে?

না। সময় কখন? পড়াশুনোতেই তো সব সময় চলে যায়।

সে তো আমিও জানি। এবার আর কোনো প্রশ্নে না গিয়ে অতীন্দ্র বললেন, শুধুমাত্র আমাদের সন্তান একা অনুভবই না। এ সময়ের অনেক ছেলেরাই এসব জানে না। সেই সঙ্গে না পারে রোদ্দুরে পুড়তে, বৃষ্টিতে ভিজতে। এসব হলে অসুখে পড়ে যায়। হবে না কেন। শরীর স্বাস্থ্যেই তো পুরুষের মতো পাকাপোক্ত শক্ত সমর্থ হওয়ার সুযোগ পায় না। এসব আরও নানা কারণেই মনে হয়েছিল একদিন।

এরপরও আবার আরও কি কারণ থাকতে পারে? মণিমালা অবাক।

অজস্র কারণ। বলে শেষ করা যাবে না।

সেদিন আর কিছু না বললেও দীর্ঘকাল পর বাজার করা প্রসঙ্গে একদিন অতীন্দ্র পুরনো একটা ঘটনা মণিমালাকে স্মরণ করালেন, মনে আছে তোমার—সেবার বাজার থেকে মাগুর মাছ এনে অনুভব কি বলেছিল?

মনে নেই আবার? মণিমালা হেসে উঠলেন, বলে কিনা তোমার বউমাকে শোল নারকোলের সেই ঝোলটা শিখিয়ে দাওতো।

শুধু কি তাই? এরা বাজার করবে কি!—ভালোমন্দ মাছ সব্জীটাই তো চেনে না।

আমিও কিন্তু অনেক সময় ভাবি। মণিমালা কিছুটা উদাস হয়ে বললেন, কি ভাবি জান? ভাবি কত ভাই বোন ছিলাম আমরা। বাবার তো তেমন সামর্থ ছিল না। দেশ ভাগের পর এপারে এসে কত বিপদ আপদ কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হতে হয়েছে। সেজন্যই বোধহয় কোনোও বিপদেই ভয় পাই না। কোনোও কষ্টেই ভেঙে পড়ি না।

ঠিক তাই। অতীন্দ্র সহমত হয়ে মন্তব্য জুড়লেন, এ কারণেই সে সময়ে এত আত্মহত্যা ছিল না। স্কুল আর বাড়িতে কম মার খেতে হয়েছে? এখন তো স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর কান, চুল টানলেই অজ্ঞান হয়ে যায়। বেতের মার খেলে কি হতো কে জানে।

সবই অভ্যাস অনভ্যাসের ব্যাপার। মণিমালার মন্তব্য।

এই অনভ্যাসেই তপেন্দ্র ছিল জুবুথুবু। সর্বকনিষ্ঠ বলে আদর বিলাসিতাটাও পেয়েছে সবার কাছ থেকে সবচাইতে বেশি।

সেই তপেন্দ্র এখন স্নিগ্ধার ব্যবসায় যথেষ্ট কাজ করে। যখন যেমনটি স্নিগ্ধা করতে বলে থাকে। এক কথায়, বিশ্বস্ত অনুগত।

ওদের ব্যবসাটা হল ঘরে বসে জুতা তৈরি করা।

এখানে এখন ঘরে ঘরে জুতার তৈরির কুটির শিল্প। মূলধন কাঁচামাল জুতার নকশা আর যথাযথ নির্দেশ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে এখানকার বিশ্ববিখ্যাত বৃহৎ জুতা প্রস্তুত কারখানা কর্তৃপক্ষ। যেহেতু উৎপাদিত জুতার আসল মালিক ওরা তাই প্রধান শর্ত থাকে, গুণমান অবশ্যই ওদের সুনাম অনুযায়ী হতেই হবে।

জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে ইদানিং অনেক বিখ্যাত কোম্পানীই আর কর্মী সংখ্যা বাড়াচ্ছে না। বরং এই পদ্ধতিতে কাজ করিয়ে ক্রমশ কর্মী সংখ্যা কমিয়ে আনছে কেননা, এতে ঝুঁকি ঝামেলা কম।

নিয়ত উর্ধ্বমুখি শ্রমিক কর্মীর বেতন ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধায় উৎপাদন মূল্য যা দাঁড়ায় এই প্রথায় খরচ তার চাইতে কম পড়ে।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের সময় ফাঁক ফাঁকির দিকে অত্যন্ত কঠোর নজরদারি রাখে। ফলশ্রুতি, উৎপাদিত জুতাগুলির গুণমান কারখানার উৎপাদনের চাইতেও অনেক সময় ভালো হয়।

সবচাইতে সুবিধা হল, বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প সংস্থার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় সরকারপক্ষও খুশি। কেননা, স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারা মধ্যবিত্ত মানুষজনেরা তো বটেই, ওদেরকে কেন্দ্র করে কর্মহীন দরিদ্র শ্রেণীরাও নতুন করে বাঁচার দিশা পাচ্ছে।

ফলশ্রুতি, বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলি অতি সহজেই রাজ্য প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধাগুলি পেতে পারছে।

কিন্তু আজকের দিনে শ্রমিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক দল পাড়ার ক্লাব মস্তান ইত্যাদি সব দিক সামলে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবসা করার জন্য যে দূরদর্শি দৃষ্টি দরকার তা আর কজনের আছে।

তপেন্দ্রর না থাকলেও স্নিগ্ধার আছে। আর সে জন্যই ওদের ব্যবসাটা বেশ ভালো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা টের পাওয়া যায় দশ পনের জন শ্রমিকের যাতায়াতে। অনেক রাত অব্দি শ্রমিকদের কথাবার্তা আর জুতা তৈরির শব্দ শুনে।

পৈতৃক সাবেকি বাড়িতে এখন কঙ্কনাকে নিয়ে তপেন্দ্রদের তিনজনের সংসার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব ঘরগুলি নিয়েই ওদের কারখানা।

পাড়ায় এরকম কারখানা আরও অনেক আছে। ঝামেলা কম অর্থকরি লাভের মুখ চেয়ে আজকাল অনেকেই এরকম ব্যবসার জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে বেশি উৎসাহী।

ফলশ্রুতি শুধু শব্দই না। এখানকার বাতাসে সর্বক্ষণ রবার চামড়া রং আঠা ইত্যাদির গন্ধ ভাসে। বেআইনি বলে কিছু নেই।

অতীন্দ্রর একসময় অসহ্য লাগত। এখন আর অসুবিধা হয় না।

।। চার।।

অতীন্দ্র এখন রান্না করায় ব্যস্ত।

অন্যদিন এত তাড়াতাড়ি এসময় রান্নাঘরে ঢোকা দরকার হয় না। সতু তপুদের বাড়ি থেকে রোজ কিছু না কিছু রান্না করা খাবার আসেই। রোজ নাহলেও এরকম খাবার বিনিময় এখানকার রেওয়াজ। মণিমালা না থাকায় খাবার আসাটা রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সে কারণে প্রতিদিন প্রাপ্তিযোগ দেখে তবেই অতীন্দ্র রান্নায় হাত দেন। অনেক দিনতো এক জনের জন্য দু'মুঠো চাল ফুটিয়ে নিলেই চলে যায়।

আজ যে অতীন্দ্র প্রাপ্তিযোগের প্রতীক্ষায় না থেকে রান্নায় ব্যস্ত তার কারণ আছে।

সেবন্তী কাল রাত্রে ফোন করেছিলেন। আজ বিকেলে অতীন্দ্রকে ওর বাড়িতে নিয়ে যেতে আসতে চেয়েছেন। মণিমালা যে এখন এখানে নেই অতীন্দ্র তা বুঝতে দেননি। সেবন্তীকে সারপ্রাইস দিতে আজ দুপুরে এখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন।

মণিমালার উদার মন মানসিকতা সম্পর্কে সেদিন আগাম আভাস দেয়া ছিল বলেই সেবন্তী আপত্তি করেননি।

অতীন্দ্র ভেবেছেন, এই বয়সে লোক-লজ্জা ভয় ভাবনার কোনো অর্থ হয় না। উদ্দেশ্য যেখানে নির্ভেজাল গল্পগুজব আড্ডা।

আজ অদ্ভুত একটা আনন্দে মেতে আছেন অতীন্দ্র।

দীর্ঘদিন পর টেপ ডেকে রবীন্দ্রনাথের পূজা প্রেম পর্বের গান বাজাচ্ছেন। নিজেও গুনগুন করছেন।

রান্না প্রায় শেষ হয়ে এলো। ওভেনে এখন চিংড়ি মাছের মালাইকারি। ভাত তৈরি হবে খেতে বসার আগে। গরম ভাত নাহলে খাওয়া যেন ঠিক যুৎসই হয় না।

মাছ নামিয়ে স্নানটা আজ আগেই করে নেবেন কিনা অতীন্দ্র ভাবছেন এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

দরজা খুলে দেখলেন, সতীন্দ্রর বাড়ি থেকে ভেট এসেছে।

কচুবাটা আর বজরি ট্যাংরার চচ্চড়ি। এনামেলের ছোট্ট ডিব্বা দুটো এগিয়ে দিয়ে বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের মেয়েটি জানাল।

আগে এসব নিয়ে সতীন্দ্র আসত। সেই ফাঁকে এক কাপ কফি খেয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে যেত। কফি খুউব ভালোবাসে। সেজন্য সবসময় মজুতও রাখা হয় ওর জন্য। সতীন্দ্র এখনও আসে, তবে খুব কম।

তোর বাবু কোথায় রে? আগেকার দুটো ডিব্বা ফেরত দিয়ে অতীন্দ্র জানতে চাইলেন।

বাড়িতে।

কি করছে এখন?

বাগানে গাছের কাজ করছে।

মেয়েটি চলে যেতে অতীন্দ্র দরজা বন্ধ করলেন। ফের দরজা খুলে মেয়েটিকে ডাকলেন। বললেন, দু মিনিট বসে যা। একটা জিনিস রান্না করছি। হয়ে গেছে, দেব।

চিংড়ি মাছের মালাইকারির এনামেল পাত্রটা ছোট্ট পলিথিন থলের ভেতর বসিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র বললেন, এইভাবে ঝুলিয়ে নিয়ে যা। গরম আছে।

সতীন্দ্র এখন বাগানে কাজ করছে, অতীন্দ্রর ভাবতে ভালো লাগল। বেশ কেটে যায় ওর সময়। কতদিন যে বলেছে, দাদা তুই কেন যে দিনের পর দিন বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাস বুঝি না। বলিস তো বাগান করতে তোকে সাহায্য করতে পারি। অতি উৎসাহে কিছু টবও কিনিয়েছিল। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাক্রাহাট মুচিশা থেকে বেশ কিছু ফুলের চারাও কিনে দিয়েছিল। মাটি সার ওষুধ—সবকিছুর ব্যবস্থা করলে কি হবে, অতীন্দ্রর উৎসাহ না থাকায় ক'দিনেই সবশেষ।

আজ এখন, এই মুহূর্তে অতীন্দ্রর মনে হচ্ছে, বিস্তর জমি কেমন ফাঁকা পড়ে আছে। সময়ে গাছ পুতলে এতদিনে নানারকম ফুল ফলে ভরে থাকত।

ফলের কথায় সেই দামী বাণীটা অতীন্দ্রর মনে পড়ে গেল। সেই যে যার মর্মার্থ, কাজ করে যাও। ফলের আশা করবে না।

এই ভুলটাই করেছে সতীন্দ্র। ভবিষ্যতের ভাবনা একবারও ভাবেনি। এ সম্পর্কে কেউ সচেতন সতর্ক করলে বলত, আজতো খাই। কাল আল্লা আছে।

এই ঈশ্বরে বিশ্বাসী মানুষগুলির সুবিধা হল, এরা টেনশনমুক্ত।

ভালোমন্দ যা কিছুই জীবনে ঘটুক না কেন মনে করে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে। মানুষ যে নানা কারণেই উদ্বেগ আর অশুভ আশঙ্কায় নিদ্রাহীন দুশ্চিন্তায় থাকে, সতীন্দ্রর সেসব নেই। বলে কিনা চিন্তায় থেকে লাভ কি? যা ঘটবার সে তো ঘটবেই।

বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর একমাত্র নিরুদ্বিগ্ন ছিল সতীন্দ্র। সবাইকে বুঝিয়েছে, আমরা ঠিক সময়ে ভালো নার্সিংহোমে বাবাকে ভর্তি করাতে পেরেছি। আমাদের যা যা করণীয় তাতে কোনো ঘাটতি নেই। এবার মরা বাঁচা ওপরঅলার ইচ্ছা নির্ভর। যার যখন সময় হবে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। ঠিক চলে যেতে দিতেই হবে।

শরীরের সামর্থ কমতে থাকায় অথবা সতীন্দ্রর সঙ্গে থেকে থেকে এককালে ঈশ্বর আর ধর্মটর্ম সম্পর্কে উদাসীন অতীন্দ্র আজকাল আর আগেকার মতো তেমনটি নেই।

অতীন্দ্র লক্ষ্য করছেন, ইদানিং প্রিয় পরিচিত আপনজনদের মৃত্যুসংবাদ শুনলে আগেকার মতো তেমন প্রতিক্রিয়া হয় না। খুব সহজ করে ভাবেন, সময় হয়েছে তাই চলে গেছে। সময় হলে সবাইকেই একদিন এরকম চলে যেতে হবে।

মণিমালা বুঝতে চায় না। এই বয়সেও ওর এখনও অনেক পরিকল্পনা স্বপ্ন। থাকবে না কেন!

অতীন্দ্রর ধারণা, শুধুমাত্র মণিমালা না। অধিকাংশ নারীরাই এমনতর। 'হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে' চায় না। তাই বোধহয় ঈশ্বর ওদেরকে পুরুষ মানুষটির চাইতে অধিক দিন বাঁচিয়ে রাখে।

আবার কলিংবেল বেজে উঠল।

সেবন্তীকে আশা করে অতীন্দ্র দরজা খুলে দেখলেন, স্নিগ্ধা যথারীতি স্টিলের টিফিন বাক্স হাতে।

তোমাদের বলেছি যে আগের দিন ফোনে জানিয়ে রাখবে কে কি পাঠাবে। অতীন্দ্র কিছুটা অনুযোগের স্বরে বললেন, আজতো আমার রান্না কমপ্লিট।

তাতে অসুবিধা হবে না। টিফিন বাক্সটা নিজের হাতে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে স্নিগ্ধা বলল, আপনি পায়েস ভালোবাসেন তাই।

সতু কি ভালোবাসে জান? অতীন্দ্র বেফাঁস জিগ্যেস করলেন।

জানব না কেন—অনেক কিছুই তো ভালোবাসে।

ওর প্রিয় খাবার পাঠাও কোনোদিন? আমি জানি ও বাড়িতেও খাবার পাঠাও, কিন্তু প্রিয় জিনিসটা না। আমি এসব বলছি বলে কিছু মনে করছো নাতো? অতীন্দ্র নরমে গরমে বললেন।

আপনি আমার বাবার মতন, বলতেই পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ত্রুটি দেখলে ধরিয়ে দেবেন।

তপুকেও একদিন তোমাদের বড়বৌদিকে বলতে শুনছিলাম, সে নাকি ওর মার মতো। তোমরা দু'জনেই কিন্তু ঠিক বলছো না।

আপনি কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি বলতে চাইছি, আমরাতো হালে এখানে এসেছি। তোমরা এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছো। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখ। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। যথার্থ দু''জনকে তোমরা কিন্তু এখন আর মা বাবার মতো ভাবছো না। আমি তো জানি, কি না করেছে ওরা তোমাদের জন্য।

আমরাতো দাদা সেটা অস্বীকার করি না। স্নিগ্ধা মিন মিন করল।

ঈশ্বরকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করে—এমন কথা ক'জনের মুখ থেকে আর শোনা যায়। তার অর্থ কিন্তু এই দাঁড়ায় না যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। এখানে এসে ইস্তক দেখে শুনে কখনও মনে হয় না সতুর প্রতি তোমাদের বিন্দুমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা আছে। সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না।

আসলে সবাইতো ব্যস্ত এখন। একসঙ্গে একই ছাদের তলায় থাকাকালে যেমন দেখাসাক্ষাৎ ওঠাবসা সেটা তো এখন সম্ভব হচ্ছে না। তাই হয়তো আপনার মনে—

সেজন্য মনে হচ্ছে না। অতীন্দ্র থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমাকে অযথা বোঝাতে চেষ্টা করছো। হৃদয়ের টানটাই আসল ব্যাপার! এসব ঠিকঠাক থাকলে দূরকে দূর মনে হয় না। নইলে নিকটে থাকলে দূরের হয়ে যেতে হয়। নিজের সন্তানকে দিয়ে এটা আমি বেশ মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি।

অনুভব ওরা কি আপনাদের খোঁজখবর নেয় না। এমন কথা কেন বলছেন?

সেটা তুমি নাইবা শুনলে। কথায় আছে আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড। দূরে থাকা জনদের কথা বাদ দাও। আমরা যারা কাছাকাছি আছি অন্তত তাদের বেলায় যেন সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

বিশ্বাস করুন, ঠিক এই কথাটাই আপনার ভাইকে আমি বোঝানোর অনেক চেষ্টা করি। সেই সঙ্গে এমনও বলি যে, কাজের বেলায় কাজী আর কাজ ফুরালে পাজি—এটা ঠিক না।

সতুদের সঙ্গে এখনো যেটুকু সম্পর্ক বজায় আছে সেটা যে তোমারই জন্য তা আমি বুঝতে পারি। তুমি কিন্তু একটা কথা ঠিকই বলেছো, পাজি! ইয়েস কম বেশি আমরা প্রতিটি মানুষই অনেকের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম উপকার সুযোগ সুবিধা নেয়ার পর পাজি হয়ে যাই। এই আমিও ব্যতিক্রম কিছু না।

অতীন্দ্র ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বাক্‌রুদ্ধ হলেন।

স্নিগ্ধাও নির্বাক। অপ্রস্তুত।

উন্মুক্ত দরজা দিয়ে একটা গাড়ি এসে থামতে দেখা গেল। গাড়ি থেকে নেমে সেবন্তীকে এগিয়ে আসতে দেখে স্নিগ্ধা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। যাবার আগে বলল, একা আছেন। কোনোও কিছুর দরকার হলে অবশ্যই ডেকে পাঠাবেন।

পাশ কাটিয়ে স্নিগ্ধা চলে যাওয়ার পর রোদ চশমা খুলে সেবন্তীর প্রশ্ন, কে?

কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ।

আমারও তাই যেন মনে হল। অবাক মনঃক্ষুণ্ণ সেবন্তী বললেন, আমাকে যেন চিনতেই পারল না। কেমন না চেনার ভান করে একটাও কথা বলল না।

তোমরা একে অপরকে চেন?

বিলক্ষণ। ওদের মেয়ে কঙ্কনাতো আমাদের স্কুল থেকেই এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। আগের স্কুলটা ছিল মাধ্যমিক পর্যন্ত। ভালো ছাত্রী না। রেজাল্টের নম্বরও খুবই খারাপ। তবু এমন ভাবে আমাকে ধরেছিল যে আমাকেও অনেক ধরাধরি করে ভর্তি করতে হয়েছিল। স্কুলে বেশ বদনামও হয়েছিল সে সময় আমার।

সেটাই তো স্বাভাবিক। বদনাম হবে জেনেও করলে কেন?

তোমাদের ফ্যামিলির রেফারেন্সের জন্য। তপু অবশ্য তেমনভাবে কোনো অনুরোধ করেনি। কিন্তু তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূটি। কোথায় কাকে কেমনভাবে ধরাধরি করলে কাজের কাজ হবে বেশ রপ্ত করেছে। এখন তো শুনি, পার্টির ক্ষমতাবান লোকজনেরাও ওর আব্দার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না।

হ্যাঁ আমাদের আড্ডার বন্ধুরাও সেরকমই বলে শুনি।

থাক ওসব কথা। সেবন্তী মিষ্টির প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা কোথায় রাখবে রাখ।

সেই টিপিক্যাল বাঙালিআনা!

তুমি কি আমার কাছ থেকে সাহেবিআনা চাও?

কিছুই তো চাইনি।

চাইতে জানতে হয়। খুব নিম্নস্বরে সেবন্তী বললেন, না চাহিলে কি আর সবার ভাগ্যে পাওয়া হয়।

তাই বোধহয় তোমার আমার বুক ফাটল তো মুখ ফুটল না বলে এই বয়সেও আপশোস, তাই না? অতীন্দ্র মুচকি হাসলেন। অর্থপূর্ণ হাসি।

চুপ চুপ। সেবন্তী ঠোঁটে আঙুল তুলে বললেন, বৌদি শুনলে সব্বোনাশ হয়ে যাবে। আমাদের এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে যে।

ধুর বয়স। মণিমালা যে বাড়িতে নেই সেই খবরটা গোপন রেখে অতীন্দ্র বললেন, বয়স কি শুধু বছরেই বাড়ে নাকি। অকালপক্ক বলে একটা কথা আছে। অনেকে আবার বেশি বয়সে পাকে, পাকামি করে।

আমার কিন্তু এসব কথা শুনতে একদম ভালো লাগছে না।

বেশ, আর বলব না। অতীন্দ্র অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, তুমি আসতে এত দেরি করলে কেন?

সংসারধর্ম আছে তো। সকালেই তো মেয়েদের বেশি কাজ। তোমরা পুরুষরা এসব কোনোওকালে বোঝনি, বুঝবেও না।

এখনকার পুরুষরা কিন্তু যথেষ্ট বোঝে। স্ত্রীদের অনেক কাজে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে থাকে।

ইয়েস, এখনকার পুরুষরা। তুমিতো আর এখনকার না।

তবুও। যারা বাইরে চাকরি করে তাদেরকে ঘরের কিছু কিছু কাজকর্ম করতেই হয়। এমনকি চালিয়ে নেয়ার মতো রান্নাবান্নাও জানতে হয়। আমি কিন্তু বেশ ভালোই রান্না করতে পারি। খেলে বুঝতে পারবে।

সেটা কবে?

আজকেই।

সেকি!

ইয়েস। তোমার বৌদি বাড়িতে নেই যে। বেশ কিছুদিন হল, চেন্নাই-এ মেয়ের কাছে গেছে। এরকম প্রায়ই এদিক সেদিক যায়। থাকে।

অমিও তাই ভাবছিলাম, বৌদিকে দেখছি নাতো। বৌদির অনুপস্থিতিতে আমাকে এভাবে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।

বেঠিক কি দেখলে?

সেটা বোঝার মতো বয়স নিশ্চয়ই তোমার হয়েছে তাই না?

বয়স বয়স বয়স। অতীন্দ্র আক্ষেপ করে বললেন, অনেকের অভ্যাসটাই হল বয়সটা মনে করিয়ে দেয়া। নিজে টের না পেলেও অন্যেরা উঠতে বসতে স্মরণ করাবে, তুমি বুড়ো হয়েছো, বুড়ো হয়েছো।

বুড়ো না ভাবলে তো আরও বিপদ।

কিসের বিপদ?

ভাবতে পার—আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগে শুধুমাত্র আমরা দুজনে এই বাড়িতে।

পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন—এই তো?

সেটা তো বটেই। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি? অতীন্দ্র নিমেষে পরিবর্তিত মানসিকতায় তাচ্ছিল্যের ঢঙে বললেন, মারো গুলি। সারা জীবন শুধু ভেবে ভেবেই মরেছি। আর ভাবতে চাই না। এখন থেকে বাকি জীবন চলব, যেমন খুশি। আপাতত সাড়ে তিন মিনিট সময় দাও, দু'কাপ কফি করে আনছি।

অসময়ে এখন কফি!

চা কফির আবার সময় অসময় কি! অতীন্দ্র যেন ক্রমশ আরও বেশি চনমনে হয়ে উঠছেন। বললেন, একটু আগেই তো বললাম, চলব এখন যেমন খুশি। তুমি বরং ততক্ষণে একটু ফ্রেস হয়ে নাও। নয়তো গান শোন আর ম্যাগাজিন পড়।

অতীন্দ্র কফি করতে গেলেন।

সেবন্তী এখন বিশাল ডাইনিং কাম ড্রইং রুম ঘুরে দেখছেন। ডাইনিং স্পেসটা একধাপ নিচে। এই সীমারেখা থেকে দোতলার করিডোর অব্দি পাক খেয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে। নিচে থেকে দোতলার ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। চারদিকের দেয়াল আর ছাদে অপূর্ব সুন্দর নকশা কাটা সিমেন্ট প্লাস্টার। প্লাস্টার অব প্যারিস। তার ওপর রুচিসম্মত মিষ্টি রং যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে।

সৌখিন আসবাবপত্রে সাজানো সবকিছু যেন সিনেমায় দেখা ধনীদের ঘরদোরের মতো।

সিঁড়ির মুখ থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে টাঙানো ল্যামিনেশন করা ফটোগুলি দেখে সেবন্তীর চিনে নিতে অসুবিধা হল না—কোনটা কার?

সেবন্তীর মনে প্রশ্ন জাগল, ড্রইংরুমে নজরে পড়ার মতো পারিবারিক পরিচিতির এই ফটোগুলি প্রদর্শনের গূঢ় অর্থ কি?

সবাইকে দেখানো—সুখি পরিবার?

কি দেখছো অমনভাবে? অতীন্দ্র কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে ফটোর মানুষগুলির পরিচয় দিতে গেলেন।

প্রয়োজন হবে না। সেবন্তী থামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার মেয়ে জামাই পুত্র-পুত্রবধূ নাতি নতানি কাউকেই চিনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু মা বাবার ফটোতো দেখছি না।

ঠাকুরঘরে রাখা আছে। অতীন্দ্র কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, সাধারণত ড্রইংরুমেই প্রয়াত মা বাবার বিশাল ফটো দেখতে পাওয়া যায়। আমিও তাই করতাম।

তাহলে?

সবকিছুই সাজিয়েছে সতু। ওই বোঝাল, মৃত্যুর পর মা বাবাতো ঠাকুর হয়ে যায়। কাজেই ঠাকুরঘরে থাকাই ভালো। তাছাড়া, ওখানে থাকলে পুজোর ফুল আর সন্ধ্যার আরতিতো পাবে।

ঠিক কথা। আমারও তাই মনে হয়।

সতুর বাড়িতে গেছো কোনোওদিন—ঠাকুরঘর দারুণ সুন্দর তাই না?

হ্যাঁ। মন্দিরের আদলে তৈরি আসনখানার তো তুলনা হয় না। সতু ভীষণ ঠাকুর-ভক্ত মানুষ।

ওর বাড়িটা তোমার কেমন লাগে?

সামর্থ অনুসারে খুবই সুন্দর। তোমার সামর্থ বেশি—তাই তোমার বাড়িটা আরও বেশি সুন্দর।

শুধু সামর্থ থাকলেই হয় না। রুচি থাকা চাই। আবার শুধু রুচি থাকলেও হয় না। আর্থিক সামর্থ থাকা দরকার। আমার সামর্থের সঙ্গে সতুর রুচি যোগ না হলে হতো না।

সতুর কিন্তু অনেক কিছু প্রতিভাই ছিল, কোনোটাই ফুল হয়ে ফোটার সুযোগ পেল না। এসব নিয়ে কেউ কিছু বললে কি শোনায় জান?

কি?

সংসার নিয়ে যারা বড় বেশি ব্যস্ত থাকে তাদের পক্ষে প্রতিভা নিয়ে জন্মালেও কিচ্ছুটি হয় না।

সত্যিই তাই। জ্যেষ্ঠ সন্তান না হয়েও সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়েই ওর সব প্রতিভা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে।

এ টি এম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে সেদিন সেবন্তী সম্পর্কে অতীন্দ্রর কিছুই জানা হয়নি। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ দেখা সেদিনকার স্বল্প সময়ে সেটা সম্ভবও ছিল না।

দুপুরে খাবার টেবিলে অতীন্দ্র প্রথম জানতে চাইলেন, তোমার বিয়ে হয়েছে কোথায়?

খিদিরপুরের কবিতীর্থে। সেবন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, জেনে কি লাভ?

জানতে ইচ্ছে হল তাই।

এরপর নিশ্চয়ই জানতে চাইবে, স্বামী কি কাজ করে! সেবন্তী কিছুটা বাঁকা হেসে বললেন, আদিতে এখানে নদীর ধারে ওদের বেশ কয়েকটি ইটভাঁটা ছিল। পিতৃপুরুষের আদি বাড়িও ইটভাঁটার কাছেই। তিন পুরুষের ব্যবসায় নানা পরিবর্তন এসেছে। সেইসব ব্যবসার সুবিধার জন্যই সবাই পাকাপাকি কলকাতায় থাকতে শুরু করে।

তুমি তাহলে এখানে এলে কেমন করে?

সে অনেক ঘটনা। সেবন্তী খাওয়া থামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ওড়ালেন। তারপর অতীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, সেসব নাইবা শুনলে। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, প্রথম থেকেই ব্যবসায়ী পরিবারের মানুষজনের সেকেলে মানসিকতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছিলাম না। সেটাই অন্যতম কারণ ছিল।

বুঝতে পারছি, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বলতে অসুবিধা আছে। সুতরাং বলতে হবে না।

কিছুটা অন্তত তোমার শোনা দরকার।

যেমন?

আমার স্বামী কিন্তু আদৌ সংযমী পুরুষ ছিল না।

ছিল না মানে? অতীন্দ্র কৌতূহলী হলেন।

এখন নেই তাই।

নেই তাই মানে? অতীন্দ্র অবাক হয়ে বললেন, হেঁয়ালি ছেড়ে আসল ঘটনাটা বল।

চারিত্রিক নানা দোষে দুষ্ট মানুষটি চাইত আমি স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিই। সাংসারিক সর্ব কর্মের কর্মী হয়ে উঠি।

সেই নিয়ে খটাখটি খিটিমিটি—এইতো? অতীন্দ্র হালকা মেজাজে বললেন, এই সমস্যাটা একা তোমার বেলায় নয়। তারপর কি হল?

চাকরি ছাড়ার জন্য চাপটা বেড়েছিল কনসিভ করার পর। স্বচ্ছল সাবেকি পরিবারের সকলেই চাইল, অন্তত সন্তানের মুখ চেয়ে আমি যেন ইস্তফা দিই।

তুমি নিশ্চয়ই তা করলে না?

কেন ইস্তফা দেব? সেবন্তী চোয়াল শক্ত করে বললেন, শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদন আর লালন পালনের জন্যতো আমি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা হইনি। তাছাড়া, আত্মসম্মানবোধ একটা বড় ফ্যাক্টর।

বুঝলাম। অতীন্দ্র খাওয়া শেষ হতে বললেন, 'নেই তাই' কথাটার যথার্থ অর্থটা কিন্তু এখনও জানা হল না। সেই অসংযমী পুরুষটির অবস্থান এখন কোথায়?

বিবাহ বিচ্ছেদের দরকার হয়নি। তার আগেই লিভার কিডনির রোগে অকালে মারা গেছে। একমাত্র সন্তান সৃজন এখন মাসকটে। তোমার অনুভবের মতোই একটি মেয়ে ওর, যাকে ফটোতেই বাড়তে দেখছি।

অর্থাৎ এখানে এখন শুধুই তুমি একা?

ঠিক তাই। তবে এতদিন স্কুলে পড়ানো আর পরীক্ষার খাতা দেখায় ব্যস্ত থাকতে হতো বলে নিঃসঙ্গ লাগত না। এখন বড্ড নিঃসঙ্গ লাগে।

অনেকটা আমার মতোই অবস্থা তাহলে।

ন্নাহ্। সেবন্তী টেবিলের এঁটো কাঁটা গুছিয়ে এক করে বললেন, তাহলেতো তোমার মতো বুড়োদের আড্ডায় গিয়ে বসতাম।

ওগুলো ওখানেই থাক। কাজের মাসি আসবে ধুয়ে দিতে।

অতীন্দ্র হাত মুখ ধুতে উঠে দাঁড়ালেন।

।। পাঁচ।।

যথেষ্ট বয়স হলেইবা কি সেবন্তী সারাদিন!

বিশেষত মণিমালার অনুপস্থিতিতে অতীন্দ্র যখন একা বাড়িতে!

তারপর আবার নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ানো!

রীতিমতো মুখরোচক খবর হয়ে দাঁড়াল। পাঁচকান হয়ে বাতাসে ভাসল। দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ছড়িয়ে পড়তে তেমন সময় লাগল না।

হ্যারে ছোট, তুই ঠিক বলছিস তো? ফোনের অপর প্রান্ত থেকে মণিমালা উদ্বিগ্ন জিগ্যেস করলেন।

যাওয়ার আগে দেখাশুনোর দায়িত্ব দিয়েছিলে তাইতো জানালাম। এপার থেকে স্নিগ্ধা বলল, আমার যেন দোষ না হয় বড়দিভাই।

তার মানে তোর দেয়া পায়েসটা ওকেই খাওয়ানো হয়েছে! ওপার থেকে মণিমালা বললেন, তোর দোষ হতে যাবে কেন। আমি বুঝতেই দেব না কোথা থেকে খবরটা আমার কানে এসেছে।

জলু জামাই আর ঈষি তোমার ধারে কাছে নেইতো? স্নিগ্ধা জানতে চাইল।

একজন বাথরুমে, অন্যজন রান্না ঘরে। কেন?

ওদেরকে যেন জানিও না। স্নিগ্ধা সতর্ক করে বলল, শুনলে ওদের মন খুউব খারাপ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, তুমি হয়তো মিছেমিছি খারাপ কিছু ভাবছো।

সেটাই যেন হয়। শেষ বয়সে মানুষটা এমন পাল্টে যাবে বিশ্বাস হয় না।

একটা কথা বলব বড়দিভাই?

কি কথা?

বড়দাকে এভাবে একা ফেলে প্রায়ই তোমার চলে যাওয়া ঠিক না। এই বয়সে একা থাকতে কারও ভালো লাগে নাকি।

পাকা পাকা কথা বলতে হবে না। মণিমালা শাসন-স্বরে বললেন, তোর টেলিফোন বিল বাড়ছে। ওরা দুজনে অফিসে বেরিয়ে গেলে এবার থেকে আমিই তোকে ফোন করে খোঁজ খবর নেব। তুই বরং আগের তুলনায় একটু বেশি আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করিস।

বেশ তাই হবে।

আর দেখিস, তপু ঠাকুরপো যেন টের না পায়। ওতো একটা হাঁদারাম।

সে আর তোমাকে বলতে হবে না। চিন্তাটা অন্য জায়গায়।

কোন জায়গায়?

তিন বাড়িতে তো একই ঠিকে ঝি। ওরাই তো বড় রিপোর্টার। স্নিগ্ধা শুনেত পেল ঈষিতা জিগ্যেস করছে, কার ফোন মা?

তোর ছোট্‌কাকির। মণিমালা বললেন।

এই অসময়? তেমন কোনো খবর আছে নাকি?

মণিমালা কোনো জবাব দেয়ার আগে স্নিগ্ধাকে বললেন, এখন রাখছিরে ছোট। ওদের অফিস যাওয়ার সময় হলো।

মণিমালা রিসিভার রাখতে স্নিগ্ধার মনে হল, এই খবরটা সেজদিভাই নবনীতাদের বাড়িতে না পৌঁছানোই ভালো। কেননা সংসারও তো বিচিত্র এক রাজনীতির ক্ষেত্র। ইদানিং ওদের চাইতে এ বাড়ির সঙ্গেই বড়দিভাইদের ওঠাবসা মেলামেশা দহরম মহরম বেশি।

সুযোগ পেলে ওরা এই ঘটনাটাকে একটা ইস্যু করতে পারে।

স্নিগ্ধা না চাইলেও খবরটা সতীন্দ্রদের বাড়িতে পৌঁছাতে সময় লাগল না। যে মানুষটি কস্মিনকালেও সতীন্দ্রকে চিঠি দেয় না, ফোন করে না সেই অনুভবই বিস্মিত করে বলল, কাকু তোমরা সবাই কেমন আছো?

হঠাৎ আমাদের খোঁজ নেয়ার কারণ। সতীন্দ্র নিরুত্তেজ উন্নাসিক মন্তব্যসহ জবাব দিল, চলে যাচ্ছে একরকম।

কাকু তুমি রাগ করতেই পার। চিরকাল বিনয়ী নরম স্বভাবের অনুভব বলল, তুমিতো ভালো করেই জান চিঠি লেখা ফোন করার অভ্যাস আমার কোনোদিনই ছিল না। এখনও নেই। ওসব যোগাযোগ অংকিতাই রাখে।

আমার এখানে বিজয়া আর বাংলা নববর্ষে ফোন বা এস এম এস আসতো। এখন ওসব কিছুই আসে না। আসবেই বা কেন। চাকরি করছে। ওখানে থাকতে থাকতে মেমসাহেব হয়ে গেছে যে।

হ্যাঁ। সেই অনুযোগও তোমরা নিশ্চয়ই দিতে পার। এরকম যে হবে তা আমি জানতাম। বিদেশে এসে ছেলেরা যত না পাল্টায় তার চাইতে ঢের বেশি পাল্টে যায় মেয়েরা। আমি কিন্তু এখনো সিগারেট মদের নেশা করিনি। কিন্তু অংকিতা বিলকুল বদলে গেছে। ইন ফ্যাক্ট ওর অনিচ্ছাতেই আমার আর দেশে যাওয়া হয় না। হবেও না।

বাদ দে ওসব কথা। আগেকার মতোই স্নেহসিক্ত সতীন্দ্র বলল, হঠাৎ কি দরকারে ফোন করছিস বল আগে। দরকার ছাড়াতো নিশ্চয়ই ফোন করিসনি।

তোমার অনুমান সত্যি। এখানে কিন্তু সবাই তাই। অপ্রয়োজনে সময় ব্যয় করে না কেউ। দারুণ ফাস্ট লাইফ। অলওয়েজ ব্যস্ততা।

তোর কিন্তু ফোনের বিল বাড়ছে। সতীন্দ্র সতর্ক করল, আসলে নিজের কিছু বকেয়া জরুরি কাজের জন্য।

ওটা এখানে আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না। সেটা তুমি আমার বিয়ের আগে একদিন টের পেয়েছিলে। কাকু তোমার মনে আছে?

মনে থাকবে না আবার! পাক্কা সত্তর মিনিট নাগাড়ে কথা হয়েছিল দুজনে। বিষয় কি? পাকা কথার পরও যখন ওরা বিয়েটা ভেঙে দিয়েছে তো আমাদের খোকাবাবু জীবনে আর বিয়েই করবে না। আমি বলেছিলাম, ওই দিনেই তোকে অন্য পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেব—ইট ইজ মাই চ্যালেঞ্জ। হয়েছি কিনা ওই দিনেই তোর বিয়ে? তোর বাবার বিয়ের ব্যবস্থাও কিন্তু আমিই করেছিলাম।

শুনেছি। ইয়েস, এসব অবশ্যই তোমার ক্রেডিট।

তোরটা সম্ভব হয়েছে অবশ্য তোর জন্যই। তুই বলেছিলি, তোমার পছন্দই আমার পছন্দ। যাকে সিলেক্ট করবে তাকেই আমি বিয়ে করার জন্য দুদিন আগে হাজির হব। এমন ফ্রি হ্যান্ড ক্ষমতা না দিলে সম্ভবই হতো না।

আসলে বিশ্বাস। বললে বিশ্বাস করবে কিনা, আজও তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাসও বলতে পার। সেই বিশ্বাসেই তোমার মুখ থেকে শুনে একটা শোনা কথা যাচাই করে নিতে চাইছি। বিশেষ করে বাবার সঙ্গে তো তোমার বন্ধুর মতো সম্পর্ক।

কি কথা জানতে চাইবি জানি না। তবে কথা প্রসঙ্গে আগেই জানিয়ে রাখি, বড়দার সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও ঠিক আগেকার মতো তেমন ঘনিষ্ঠতা কিন্তু নেই।

হ্যাঁ শুনেছি। সেটা বোধহয় ঈষির বিয়ের পর থেকেই। আমার বিয়েতে তুমি যেমন এ্যাকটিভ পার্ট নিয়েছিলে ওর বিয়েতে তেমনটি নেয়া দূরের কথা বরং সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছো। সত্যি মিথ্যে কেমন করে বুঝবো—আমরা তো এ্যাটেন্ড করতেই পারিনি।

ঘটনা সত্যি যে ঈষিতার বিয়ের সময় সতীন্দ্র কিছুটা অন্তরালে নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা করেছে।

কারণ ছিল।

অনুভবের বিয়েতে অতীন্দ্রর তরফে অনেক কিছু ত্রুটি হয়েছিল। যে কোনো বড় কাজে কিছু কম বেশি ত্রুটি থাকেই। বাঙালির বাড়িতে আত্মীয় স্বজন দশ জনের জমায়েতে ত্রুটি নিয়ে চর্চা অনিবার্য। কিন্তু অতীন্দ্র যেহেতু গর্ব করে প্রচার করে থাকেন যে, সতীন্দ্রই ওর ফ্রেন্ড ফিলজফার লিগ্যাল এ্যাডভাইসার তাই সব ত্রুটির দায় এসে পড়েছিল সতীন্দ্রর ওপর।

অথচ ঘটনা হল, সতীন্দ্রর অনেক পরামর্শ বা সতর্কীকরণই মানা হয়নি। যেমন মানা হয়নি, পৃথকভাবে পান ভোজনের আয়োজন।

চাকরি জীবনে বেশি সময় বহির্বঙ্গে থাকা অতীন্দ্র এই ব্যবস্থায় সতীন্দ্রর আপত্তিতে অবাক হয়েছিলেন।

সতীন্দ্র বোঝাতে চেয়েছে, এখানকার সামাজিক পরিবেশের মানুষজনের মন মানসিকতা এখনও এসব মেনে নেওয়ার পর্যায়ে আসেনি।

সেই সময় ইংরেজি মাধ্যমে পাশকরা অনুভব আর ঈষিতা কিন্তু অতীন্দ্রর পক্ষেই দাঁড়িয়েছিল।

তোর শোনা কথাটা মিথ্যা না। সতীন্দ্র সংক্ষেপে কারণটা ব্যাখ্যা করে বলল, ঈষিতাকে সম্প্রদান কিন্তু আমিই করেছি।

বাদ দাও ওসব কথা। কিছুদিন পর আবার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। অযথা টেনশনে থেকো না।

জানিস তো, আমি টেনশন-ফ্রি মানুষ। ওপরঅলায় বিশ্বাসী বলেই সেটা সম্ভব।

সেদিক থেকে সত্যিই তোমার তুলনা হয় না। আজকের দিনে ক'জন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে—যারা টেনশন ফ্রি?

থাক ওসব কথা। সতীন্দ্র কথার মোড় ঘোরালো, কেন এতদিন পর ফোন করছিস সেই কারণটাই তো তোর এখনও বলা হল না।

এখন ভাবছি, তোমাকে জিগ্যেস করা উচিত হবে কিনা!

মনে দ্বিধা থাকলে বলিস না। সতীন্দ্র নিরাসক্ত জবাবে বললেন, আমি তো তোকে কত বোঝাতাম। কি বলতাম বলত?

বলতে, দ্বিধা নিয়ে কোনো কাজ করতে নেই। যে কাজে মনের সায় সাড়া পাওয়া যায় না সে কাজ না করাই ভালো। মনের দিক থেকে বাধা না আসলে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেও কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

মনে রেখেছিস তাহলে। সতীন্দ্র বিস্মিত খুশি হয়ে বলল, শুধু মনে রাখলেই তো হবে না। নিজের জীবনে ব্যবহার করতে হবে।

বেশ, তাহলে ব্যবহার করছি দেখ। অনুভব হাসির শব্দ তুলে বলল, আমি, দ্বিধাহীন নির্ভয়ে জানতে চাইছি বাবা কি এই বয়সে কারও সঙ্গে প্রেম ভলোবাসায় জড়িয়ে পড়েছে? নাকি নিছকই বন্ধুত্ব টন্ধুত্ব?

কি বলছিস তুই! সতীন্দ্র এই প্রথম শোনা কথায় অবাক হয়ে বলল, এত কাছে থেকে আমি যা জানি না তুই শুনলি কোত্থেকে?

শুনেছিতো অংকিতার কাছ থেকে। ইন ফ্যাক্ট কেউ ওর কান ভাঙানি করেছে। যদি তেমন কিছু হয়েও থাকে তাতে এত দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা আমার কিছু যায় আসে না। তবু আমার যাচাই করা দরকার। কেন জান?

কেন?

অংকিতাতো এখানে বাঙালিত্ব হারিয়ে ক্রমশই বেশিরকম ওয়েস্ট্রানাইজড হয়ে উঠছে। মাঝে মধ্যে সেসব নিয়ে দু'চার কথা বলে থাকি। ভবিষ্যতে ওকে কিছু বলার সময় নিজের বাবার ব্যাপারটা মগজে রাখতে হবে।

ন্নাহ্, এখন পর্যন্ত এমন কিছু আমি জানি না।

তাহলে ধরেই নিচ্ছি এসব বদমতলবি রটনা। ওকে কাকু।

অনুভব ফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সতীন্দ্র নিজের মনকে প্রশ্ন করল, বদমতলবি রটনাটা কার হতে পারে?

রটনার সূত্রতো একটা থাকতেই হবে। প্রথম পর্বে হয়তো কোনো ক্ষুদ্রতুচ্ছ ঘটনা ছিল। সেটা ছিল নিছকই নির্ভেজাল সংবাদ। তারপর সেই সংবাদের ওপর জনে জনের রং প্রলেপ প্রসাধন পড়তে পড়তে একটা গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটাকেই নিজের ইচ্ছে মতো কাটছাট করে কোনোও বদ মতলবি সুদূর লন্ডনে অংকিতার কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

অনুভবের কানে তোলার পিছনে অংকিতারই কোনোও অংক কষা থাকতে পারে। সেরকম কোনোও হিসেব মনে থাকলে অংকিতাও নির্ঘাৎ কিছু রং চড়িয়ে থাকতে পারে।

সতীন্দ্র যখন এসব নিয়ে সাত পাঁচ ভাবছে এমন সময় নবনীতা এসে জিগ্যেস করল, এতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলে? নিজের বেলায় বোধহয় ফোনের বিল বাড়ে না।

ফোনটা আমি করিনি, এসেছিল। সতীন্দ্র বিরক্তির সঙ্গে বলল, কেউ যদি ফোন করেতো আমি কি বলব, আচ্ছা রাখছি।

তা অবশ্য বলবে না। লোকে পারেও বটে। এতক্ষণ ধরে ফোনে কথা! নিশ্চয়ই কোম্পানী বিল মেটায়।

কার ফোন এসেছিল জান? সতীন্দ্র রহস্যময় হেসে বলল, নাম শুনলে আকাশ থেকে পড়বে। সেই সঙ্গে মনে হাজার রকমের প্রশ্ন জাগবে।

কার ফোন? নবনীতা অধীর আগ্রহে বলল, হেঁয়ালি ছেড়ে বল।

তোমার আদরের অনুভবের।

এতকাল পর এমন হঠাৎ উদয়ের কারণ? নবনীতা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে স্বগত উচ্চারণ করল, বেইমান। সব বেইমান। খোঁজও রাখে না আমাদের।

এমন করে কেন বলছো! সতীন্দ্র অবাক হয়ে বলল, যত রাগ ক্ষোভ তো আমার। একেক জনের অকৃতজ্ঞ আচরণে দুঃখ পেয়ে আমি যখন প্রায়ই বলি, সকলের জন্য এত কিছু করার বিনিময়ে কি না এই—! তুমিই তো তখন মহাপুরুষদের মতো বাণী শোনাও। বল, কারও জন্য কিছু করে অত বলতে নেই। বিনিময়ে কিছু আশাও করবে না।

সেকথা এখনও বলব। নবনীতা বিজ্ঞ জনের মতো বলল, বিনিময়ে কিছু চাই না। কিন্তু অবজ্ঞা অবমাননা অকৃতজ্ঞতা নিশ্চয়ই কাম্য হবে না। দেবদ্বিজে কারও বিশ্বাস না থাকতেই পারে। পূজাপাঠ নিজ ইচ্ছা নির্ভর। কিন্তু ঘৃণা করে বিরুদ্ধাচারণ কখনও অধিকারের পর্যায়ে পড়ে না।

দাঁড়াও দাঁড়াও। সতীন্দ্র থামিয়ে দিয়ে রসিকতা করল, তুমি কি আমার অজান্তে কোনো গুরু-পার্টিতে দীক্ষা নিয়েছো। নাকি টিভি দেখা বন্ধ করে ওই সময়টা ঠাকুরঘর আর বই পড়ে কাটাচ্ছো?

ঠাট্টা করছো কেন। নবনীতা ফোন প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলল, অনুভব ওদের সঙ্গে তো আজকাল বড়দিভাইদের তেমন সম্পর্কই নেই শুনেছি। তো বাবাকে ছেড়ে বাপের মতোকে ফোন করল কোন প্রয়োজনে?

বাপের মতোকে? সতীন্দ্রর কানে বাজতে বলল, কটাক্ষ করছো। তা করবেই তো। অনুভবকে আমি কিন্তু এখনও নিজের পুত্র সন্তানের মতোই ভাবি।

এখনও! অবাক নবনীতা বলল, আমাদের যখন হবে না বলে আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই সময়কার কথা ভাবতো একবার। দু'জনেই বলতাম, তুই আমাদের মুখে আগুন দিবি।

দেবে না বলেছে কি?

নিজের মা বাবার মুখেই আগুন দেবে না তো আমাদের মুখে!

আমাদের আর দরকারই বা কি। এখন তো আর আমরা নিঃসন্তান না। মেয়েরাও এখন ছেলেদের কাজ করে। আমাদের সঙ্গীতা, বড়দাদের ঈষিতা আছে। এত ভাবনার কি আছে। তাছাড়া এটাতো ঠিক, বিদেশ থেকে ইচ্ছে করলেই উড়ে আসা সম্ভব না। নিজের বোন ঈষিতার বিয়েতে এসেছে? নাকি সঙ্গীতার বিয়েতে আসবে।

সেতো জানিই। নবনীতা অনুযোগের স্বরে বলল, তাই বলে দরকারে তোমার সাহায্য নেবে না—তেমনটি মনে করো না। এখন বলতো কি দরকারে গরীব কাকাকে ফোন করেছিল?

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সতীন্দ্র হাল্কা হাসির মেজাজে কারণটা শুনিয়ে বলল, আমরা কাছে থেকে কিছুই জানলাম না। অথচ আশ্চর্য, অনুভব কিনা—

আমরা জানলাম না মানে? নবনীতা বাধা দিয়ে বলল, আমিতো জানি। কিন্তু তোমাকে বলিনি। বললেইতো রে রে করে উঠতে। হরিহর আত্মাতো। হোক না এখন একটু ঢিলেঢালা।

কি জান তুমি? সতীন্দ্র অবাক ভুরু কোঁচকাল।

সেই যে কি যেন নাম ওর। তোমার স্কুলেও বেশ মেলামেশা ছিল। তোমার খোঁজে দু-একবার এ বাড়িতেও এসেছে। অল্প বয়সে বিধবা। স্কুল মিসট্রেস। নদীর ধারে ইটভাঁটার দিকে বাড়ি।

সেবন্তীদির কথা বলছো?

হ্যাঁ হ্যাঁ সেবন্তী। বড়দিভাইতো এখন চেন্নাই। সেই সুযোগে সেই সেদিন যেদিন আমি কচুবাটা আর বজরি ট্যাংরার চচ্চড়ি পাঠালাম সেগুলি কে খেয়েছিল জান?

সেবন্তীদি নিশ্চয়ই নয়।

তোমাকে সেদিন যে চিংড়ি মাছের মালাইকারি পাঠিয়েছিল সে তো ওর জন্যই রান্না করা। দুপুরে আমার পাঠানো রান্নাও নিশ্চয়ই সেবন্তীও খেয়েছে। সারাদিন কাটিয়ে বড়দাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেছে। বড়দা সেদিন রাত্রে বাড়ি ফেরেনি।

এতকিছু খবর তুমি জানলে কেমন করে?

এসব খবর চেষ্টা করে জানতে হয় না। উড়ে আসে। শুধু কি আমিই নাকি। ছোট বউ বড়দিভাই—সবাই জানে।

একা আমিই শুধু জানি না। সতীন্দ্র নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়াহীন বলল, আমার মনে

হয় এসব ফালতু ব্যাপার স্যাপার যত না জানা যায় ততই ভালো। নেই কাজ তো খই ভাজ। বড়দা তেমন প্রকৃতির মানুষই না। যেটুকু যা বলছো তাতে তো আমি দোষের কিছু দেখি না।

তাতো দেখবেই না। শুধু তো বড়দাই না—বন্ধুও তো বটে। দোষ দেখবে কেমন করে? দোষতো তাদের যারা দেখে শুনেও চুপচাপ থাকছে না।

হ্যাঁ দোষটা তাদেরই। কেননা, শুধুমাত্র কানে শুনে তারা অযথা আজেবাজে রটনা করে বেড়াচ্ছে। সেবন্তীদিদের সঙ্গে বড়দার কি আজকের সম্পর্ক নাকি। আমিও কি কম গিয়েছি ওদের বাড়ি। বিপদে আপদে—অনেকবার।

সে কথাই বুঝিয়ো অনুভবকে।

অনুভবকে আমি নিশ্চয়ই ফোন করতে যাব না। আমার মনে হয় না সে আবার এ ব্যাপারে আমার কাছে কিছু জানতে চাইবে। তোমার কাছ থেকেও আমি ওদের দুজনের সম্পর্কে আর একটিও কথা শুনতে চাই না।

আমিও বলতে চাই না।

শুধু আমাকেই নয়। সতীন্দ্র চোয়াল শক্ত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলল, কাউকেই তুমি যেন ওদের সম্পর্কে কিছু না বলো। এটা আমার অর্ডার মনে করতে পার। আমি চাইব না এসব বাজে রটনায় তোমার আমার নাম জড়িয়ে পড়ুক।

যাদের জড়িয়ে দেয়ার তারা জড়াবেই। নবনীতা শ্লেষের সঙ্গে বলল, ভালো মানুষ পেয়ে তোমার বদনাম করতে তো কেউ ছাড়েনি।

অতীন্দ্র সম্পর্কে নবনীতার মুখের সংবাদ শুনে সতীন্দ্রর সেদিন গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে নাহলেও মন মগজে অতি সূক্ষ্ম মসৃণ বিদ্ধ কাঁটার মতো কিছু একটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল। যন্ত্রণা বিহীন হলেও অস্বস্তিকর। আজ নন্দন থেকে ওদের দুজনকে ঘনিষ্ঠভাবে বের হতে দেখে সেই কাঁটাটা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকাল পরণের পোশাক আর হাত সিঁথির চিহ্ন দেখে সধবা বিধবা সর্বক্ষেত্রে মালুম হয় না। এ ছাড়াও শিক্ষিকা সেবন্তীর পোশাক প্রসাধন বরাবরই অতি সাধারণ সাদামাটা। তাই স্বামী যে ছিল এবং কবে থেকে নেই বোঝার উপায় ছিল না।

আজ কিন্তু সেবন্তীকে ব্যতিক্রম পোশাকেই দেখা গেছে। উগ্র রঙে না হলেও নজরে পরার মতো যথেষ্ট উজ্জ্বল শাড়ি পরেছিল সেবন্তী। মাথার ওপর ক্লিপবিদ্ধ চুলের গুচ্ছ ছিল আকর্ষণীয় স্টাইলের। পোশাকে কম যায়নি অতীন্দ্রও।

ওদের দুজনকে হাঁটতে হাঁটতে রবীন্দ্রসদন অব্দি যেতে দেখা গেছে। তারপর সড়ক পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ধর্মতলামুখি ট্যাক্সিতে উঠেছে।

সতীন্দ্রর অনুমান, হয়তো পার্ক স্ট্রীটের কোনো রেস্তোঁরায় গিয়ে থাকবে।

সতীন্দ্র ইচ্ছে করেই নবনীতাকে না বলা উচিত মনে করলে কি হবে বাড়ি ফিরেই বুঝতে পারল খবরটা আর ওর জানতে বাকি নেই।

ফোনে নবনীতার কথা হচ্ছিল। কার সঙ্গে সেটা সতীন্দ্র বুঝতে পারল না। আলোচনাটা যে অতীন্দ্র আর সেবন্তীকে নিয়ে তা অতি সহজেই মালুম হল।

নবনীতা বলে যাচ্ছে, তারপর তারপর ? নিউমার্কেট থেকে কেনাকাটা করে দুজনে নিশ্চয়ই কোথাও খেতে গেল।

কি বলছিস—বাদশায়? পার্ক স্ট্রীটের কোনো ভালো রেস্টুরেন্টে যেতে পারল না! বড়দাটা ভীষণ কৃপণ। এই বয়সেও শুধু টাকা টাকা করে। কোথাকার টাকা তুলে কোথায় রাখলে দু পয়সা বেশি সুদ পাবে তার হিসেব করে।

বাদশা থেকে বেরিয়ে ফুলের মার্কেটে গিয়ে কি ফুল কিনলো রে?

টকটকে লাল গোলাপ কিনল বলছিস। তা কিনবেই তো। বুড়ো বয়সে রঙ চাগাড় দিলে যা হয় আর কি। তারপর তারপর?

মেট্রো রেল ধরতে নিচে নামল বলছিস? তার চাইতে বলা ভালো, পাতালে নামল। কিন্তু মেট্রো রেল কেন? ও বুঝেছি। রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনে নেমে টালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরবে। এখানে রিক্সায় বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসবে। তুই এখন কোথায় বলতো। ধর্মতলা থেকে বাস না ধরে ওদের ফলো করে ফিরতে পারতিস। মোবাইলে আমি রিলে শুনতে পারতাম। ইস্‌স্‌।

সতীন্দ্রর উপস্থিতি টের পেয়ে নবনীতা ইতি টানল, এখন রাখছিরে। তোদের সতুদা অফিস থেকে ফিরেছে।

সতীন্দ্র ইচ্ছাকৃত জিগ্যেস করল না, এতক্ষণ ফোনে কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। সাধারণত যেমনটি জিগ্যেস করা হয় তেমনটি না হওয়ায় নবনীতা একটু অবাক হলেও ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে, এই মাত্র এসেছে। কাজেই কিছুই টের না পাওয়ায় বাঁচা গেছে।

সতীন্দ্র আশ্চর্যরকম নির্বাক। রোজ অফিস থেকে ফিরে যা যা যেমনটি করে আজও সেসব করল।

নবনীতাও রোজকার মতো করণীয় করল। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও ব্যয় করল না। অতীন্দ্র সম্পর্কে পাওয়া শেষ সংবাদ বেরিয়ে পড়ার ভয়ে।

।। ছয়।।

অভ্যাসটা সেবন্তীর অনেকদিনের পুরনো। চূড়ান্ত মানসিক অস্থিরতায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে পড়েন। মনের ভেতরকার জ্বালা যন্ত্রণা কষ্টগুলির উৎস সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক অথবা আধ্যাত্মিক কিছু লিখতে শুরু করেন। কিন্তু ভাবনা যতটা গভীর, কলমের আঁচড়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু বেরিয়ে আসে না। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র আপশোষ হয় না। কেননা, বুকের ভেতরকার নিরুচ্চার শব্দ বাক্য সমষ্টি গলে গলে ঝরে পড়ে। তাতেই হাল্কা বোধ হয়। বুক মাথা

পরিষ্কার হওয়ার ফলে মনে হয়, এবারও বেঁচে গেলাম। যেমনটি ডাক্তারি মতে, মারাত্মক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগী অনেক ক্ষেত্রেই বেঁচে যায় ক্ষরণের রক্ত বাইরে আসার ফলে।

দূরের নৈশ প্রহরীর ঘন্টি জানান দিল, সময় এখন সকাল চারটে। শহরতলীর নিরিবিলি এই প্রাকৃতিক পরিবেশে সকালের এই সময়কে রাতই মনে হয়।

সেবন্তী মানসিক অস্থিরতায় অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগে শয্যা ত্যাগ করলেন। সন্তর্পণে খাট থেকে নেমে তালা খুলে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠলেন। অন্ধকারে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেই মালুম হল, ছাদবাগানে পৌঁছে গেছেন।

দেড় হাজার স্কোয়ার ফুট ব্যাপী এই ছাদের শেষাংশে টিনের চালায় তৈরি একটি কটেজ। সেবন্তীর পছন্দের।

আগে ছিল শুধু ছুটির দিনে, রিটায়ারমেন্টের পর এখন সকাল বিকেল প্রতিদিন দুবেলা সেবন্তী এখানে বসে চা পান করেন। নদীর সৌন্দর্য আর সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দেখেন।

কটেজ বা কুঠোরিতে একখানা সোফা কাম বেড। লেখাপড়ার চেয়ার টেবিল। দেয়াল আলমারিতে কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখা আছে। দেয়াল-তাকে ছোট একটা রেকর্ড প্লেয়ার আর কিছু গানের ক্যাসেট।

সেবন্তী আলো জ্বেলে টেবিল বাতির বোতাম টিপলেন। তারপর ঘরময় আলো নিভিয়ে শুধুমাত্র টেবিলে আবদ্ধ রাখলেন। কাগজ কলম নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না লেখাটা কেমন করে শুরু করবেন। যন্ত্রণাটা যে শুধুমাত্র বুকেতেই সীমাবদ্ধ নেই। আছে মস্তিষ্কেও। স্বভাবতই সব শরীরময়। শিরায় শিরায়।

তাইতো হাতের কলমও কাঁপছে।

কাঁপার যথেষ্ট কারণ আছে।

কাল সৃজনের কাছ থেকে কিছু জরুরি কাগজপত্র এসেছে। একালের সন্তানেরা সেভাবে পিতৃমাতৃ ভক্তি আর সন্তানের কর্তব্য পালন দেখাতে চায় তেমনি কিছু নমুনাপত্র। সর্বাধুনিক।

'ইনটারন্যাশানাল লাভ এ্যান্ড লিভ' নামে একটি বিদেশি সংস্থার কলকাতা শাখা অফিস মারফৎ আসা কাগজপত্রগুলি জানান দিচ্ছে, এখন থেকে তারাই সেবন্তীর প্রতি পুত্রের যাবতীয় দায় দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে। বিপদে আপদে যে কোনোও প্রয়োজনে এস এম এস বা ফোন করলেই সংস্থার প্রতিনিধি হাজির হবে।

যে যে সুযোগ সুবিধা সেবা পরিষেবা পাওয়া যাবে সেই দীর্ঘ তালিকায় তেত্রিশ নম্বরে আছে, প্রয়োজনে সংস্থার কর্মীরাই হাসপাতালে ভর্তি করে যাবতীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে। প্রতিদিন ভিজিটিং আওয়ার্সে প্রতিনিধিরা দেখা করতে যাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বশেষ পঞ্চান্ন নম্বর সুবিধায় আছে, সদস্য মি. সৃজন দত্ত তাঁর মা-র মৃত্যুকালে

বা মৃত্যুপরবর্তী সময়ে কোনো কারণে উপস্থিত থাকতে না পারলে অনুমোদন সাপেক্ষে অন্তেষ্টিক্রিয়া কর্মাদির দায়িত্ব উল্লেখিত সংস্থার ওপর বর্তাবে। সেজন্য এককালীন সদস্য চাঁদা বাবদ যে অংকের টাকা পাওয়া গেছে তার অতিরিক্ত কিছু জমা দিতে হবে না।

এক কথায় দাঁড়ায়, ফ্রি সার্ভিস।

সেবন্তী কিছু লিখতে বসে শুধুই ভেবে চলেছেন।

এই সেই সৃজন যে মাত্র আট বছর বয়স থেকে পিতৃহীন। তার আগেই বা বাবাকে কতটুকু পেয়েছে! সে তো সর্বদিক থেকেই তখন শেষের পর্যায়ে।

সেবন্তী বুঝে উঠতে পারেন না, মানুষ কেন বিশেষ করে পুত্র সন্তান কামনা করে। যদিবা পায় তো কেনই বা জন্ম থেকেই সেই সন্তানকে নিয়ে এত বেশি স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখার জন্যই তো যত দুঃখ পাওয়া।

দুঃখ দুঃখ দুঃখ।

সেবন্তী নিজেই নিজেকে বোঝালেন, এত যার দুঃখ তারতো অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে কেন এত টেনশন। তা ছাড়া 'জীবনের কষ্টকর কান্নার অংশটুকুই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়।'

ইদানিং কেন জানি না সুখ দুঃখ আনন্দ—সব সময়ে অতীন্দ্রকে মনে পড়ে। মনে মনে ভাবেন, আমাকেও অতীনদার মনে পড়ে কি? তাহলে তো একটা ফোন করতে পারত। নিদেনপক্ষে এস এম এস।

চা খেতে খেতে সেবন্তী নিজেই অতীন্দ্রকে এস এম এস করলেন।

লিখলেন, কি করছো এখন? আমাকে কি একটুকুও মনে পড়ে না? বিশেষ একটা কারণে মনটা ভীষণ খারাপ। দেখা হলে বলব। তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী?

প্রত্যুত্তরে অতীন্দ্র লিখলেন, ঈশ্বর-ব্যাপারে আজকাল আমার ভেতরে একটা ধন্ধ বা বিচার কাজ করে। জানি না, ঈশ্বর ভাবনায় চোখে কেন জল আসে। আমি কিন্তু তথাকথিত পূজা আচ্ছা করি না। বাহ্যিক আচারে বিশ্বাসও নেই। আমি এখন খবরের কাগজ পড়ছি আর গান শুনছি। তুমি কি গান শুনতে ভালোবাসো?

সেবন্তী জানালেন, গান আর ফুল কে না ভালোবাসে। তবে আমি সেই গানই ভালোবাসি যাতে চিরকালের আকুতি থাকে। হোক গান আনন্দের কিন্তু তাকে বিষাদের ঘর-কন্না জানতে হবে। গান হতে পারে উত্থানের কিন্তু তাকে বিপর্যয় পেরিয়ে আসতে হবে। হোক গান নিরাপদের কিন্তু তার ভিতর বিপন্নতা জেগে থাকবে।

জবাবে অতীন্দ্র লিখলেন, তুমি যে শিক্ষিকা তা বোঝা গেল। মনটা যে ঠিকঠাক নেই তা লেখাতেই ধরা পড়ছে। তোমাকে একটু না, অনেক অনেক মনে পড়ে।

চাওতো তোমার ওখানে যেতে পারি। অথবা ইচ্ছে করলে তুমিও আসতে পার আমার এখানে। যেমনটি তোমার পছন্দ।

সেবন্তী ইতি টেনে লিখলেন, ভেবে দেখে পরে জানাচ্ছি।

কিন্তু দিনভর কিছুই জানালেন না।

অতীন্দ্র যথারীতি দুপুরের ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুলেন। রোজকার মতো চা তৈরি করে খাওয়ার পর পোশাক পাল্টালেন। আড্ডায় যেতে রওনা হওয়ার আগে বেশ কয়েকবার সেবন্তীকে মোবাইলে ধরবার চেষ্টা করলেন।

প্রতিবারই ক্যাসেট বন্দি জবাব এলো,... ইউ হ্যাভ কলড্ ইজ কারেন্টলি নট এ্যাভেলেবেল। প্লিজ ডায়াল আফটার সামটাইম।

অগত্যা অতীন্দ্র আর চেষ্টা করলেন না।

সময় এখন পড়ন্ত রোদ্দুরের বিকেল।

রেল সেতুর ওপরকার নির্দিষ্ট আড্ডাস্থানে ইতিমধ্যেই বলরাম শান্তিময় ভক্তিভূষণ শিবলাল এসে বসে আছে।

এ এক অদ্ভুত নেশা। সবাইকেই অদৃশ্য রজ্জুর টানে কে যেন একত্রিত করে দেয়। সকাল বিকেল দু বেলাতেই।

অতীন্দ্র যেহেতু অনিয়মিত আসেন তাই কদর বেশি। যেদিন আসেন, সবাই কম বেশি উৎফুল্ল হয়ে থাকেন।

বলরাম বললেন, সুস্বাগতম।

শান্তিময়ের কণ্ঠে রসিকতা, মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদরে।

শিবলালের প্রশ্ন, একদিন কোথায় ছিলে বন্ধু ?

ভক্তিভূষণ গানের কলি শোনালেন, তুমি এলে অনেকদিনের পরে যেন বৃষ্টি এলো।

অতীন্দ্র আয়েস করে বসে বললেন, সবাইকে একসঙ্গে ধন্যবাদ।

এই চারজনের মধ্যে শিবলাল আর ভক্তিভূষণ সমবয়সী বাল্যবন্ধু। অতীন্দ্র বসতেই আর এক বাল্যবন্ধু যোগেশ এলেন।

এরা তিনজনের বেশিদূর পড়াশুনো করেননি। সে সময় জুতা কারখানায় চাকরি পাওয়া সহজ ছিল। বিশেষত যাদের অভিভাবকরা এই কোম্পানীর কর্মী তাদের সন্তানদের চাকরি বাঁধা থাকত। সে কারণে সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলেদের সাধারণতঃ বেকার থাকতে হতো না।

এদের তিনজনের বেশিদূর পড়াশুনো করা হয়নি অল্পবয়সে এরকম চাকরি পাওয়ার জন্য।

শিক্ষা ও বৃত্তিগত বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও এদের সঙ্গে অতীন্দ্রর তুই-তাকারি সম্বোধন সম্পর্ক এখনও বজায় আছে। বন্ধুত্বতো বটেই।

যোগেশ গতকাল আড্ডায় অনুপস্থিত ছিলেন। সর্বশেষ মেয়ের বিয়ের চেষ্টায় আছেন।

রবিবারের পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে ছিল, পাত্র অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ডাক্তারের একমাত্র সন্তান। মা শিক্ষিকা। নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। গাড়িও আছে। পাত্র বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। কম্প্যুটার পাশ।

চিঠিচাপাটিতে বিস্তর সময় চলে যায়। তাই ফোনে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎ আলোচনায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মেয়ের বায়োডাটা সহ এক কপি ফটো।

শিবলালই প্রথম মুখ খুললেন, মাইয়্যার বিয়ার লাইগ্যা পোলার বাপের লগে কাইল কি কথা হইল?

যোগেশ জবাবে বললেন, ফালতু ছেলে! আমি বেশি কিছু কথা বলার উৎসাহ পাইনি। কত বড় দুঃসাহস। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়েই ছেলে বিয়ে করতে রাজি হয় কেমন করে বুঝি না।

ফালতু ছেলে মানে? ভক্তিভূষণ বললেন, কম্প্যুটার পাশ শুনেছিলাম। বেসরকারি কি চাকরি করে?

সে আর কি বলব! যোগেশ হতাশ কণ্ঠে বললেন, আমার অবশ্য একটু সন্দেহ হয়েছিল। আজকাল বিজ্ঞাপনে লক্ষ্য করছি পাত্রের বাবার পরিচয় গাড়ি বাড়ি বিত্তের বিবরণটাই ফলাও করে ছাপা হয়।

পোলার তেমন পরিচয় দেওন না থাকলে তাইতো হইবো। শিবলাল জিগ্যেস করলেন, এই পোলাডাও তাই বুঝি?

বলছি না, ফালতু। যোগেশ সংক্ষিপ্ত করে শোনালেন, কম্প্যুটার পাশ মানে পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা ট্রেনিং সেন্টার থেকে। বেসরকারি চাকরি বলতে পাড়ারই এক স্টকিস্ট এ্যান্ড সাপ্লায়ার্স দাদার বাড়ির নিচের অফিস ঘরে অল সাবজেক্টের একমাত্র কর্মী। মাইনে কত জানিস?

কত আর হবে। এবার শান্তিময় বললেন, দু'হাজার। নো এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। মুখের কথায় চাকরি। আবার মুখের কথাতেই চাকরি খতম।

ঠিক তাই। যোগেশ বললেন, এই ছেলে অবশ্য তিন হাজার পায়। সো হোয়াট।

তিন হাজারে বিয়ে? আমি মুখ ফসকে ছেলের বাবাকে বলেও ফেললাম, এখন না হয় চলে যাবে। ভবিষ্যতে সন্তানাদি হলে?

শুইন্যা কি কইল? শিবলাল কটাক্ষ করে বললেন, নিশ্চয় কইলেন, আমিতো আছি। পোলার মায় এহনো মাস্টারিতে কামাই করে। কুনো অভাব নাই।

ঠিক তাই। যোগেশ বললেন, হুবহু এই কথাগুলিই বললেন। সেই সঙ্গে আমাকে শোনালেন, রিটায়ারমেন্টের সময় যে টাকাগুলি পেয়েছেন সবই ছেলের নামে এম

আই এস করেছেন। পেনশান এম আই এস আর স্ত্রীর বেতন যোগ করতে মাসিক আয় পঁচিশ/ত্রিশ হাজার টাকা। ছেলের তিন হাজার তো ওর হাত খরচ।

তাইলে? শিবলাল বাস্তব দিক বিচারে মন্তব্য করলেন, চাকরি ছাড়াই তো বিয়া করন যায়। আইজকালকার পোলাগোই তো মজার জীবন। আমাগো মতো দেশভাগের কবলে পইর‍্যা শুইন্যো থিকা শুরু করতে হইল না। আমাগো মতো একগণ্ডা ভাই বুন না। সবেধন নীলমণি। এউক্কা বা দুইডা। বাপেতো ঘরবাড়ি সাজাইয়া রাখছে। কিছুই করন নাই।

শুধু কি তাই? শান্তিময় এতক্ষণে আলোচনায় অংশ নিলেন, আমার ভাবতে অবাক লাগে। বাড়িটা লোন নিয়ে বউয়ের গয়না বেচে কত কষ্টেই না তৈরি করেছি। একটু একটু করে শেষ করতে দশ বছর লেগেছিল। ততদিনে বাড়ি মেরামতের সময় হয়ে গেছিল।

কথার পৃষ্ঠে কথা আসে নকশি কাঁথা সেলাইয়ের মতো।

বলরাম বললেন, আমারতো পেনশান নেই। ভবিষ্যতের ভাবনায় কৃচ্ছ্রসাধন করে টাকা জমাতে হয়েছে। লেট ম্যারেজ, লেট ইস্যু। ছেলেটা তাই এখনও কলেজে পড়ছে। রিটায়ার লাইফে কলেজ পড়ানো, সংসার চালানো আর এই সেদিন মরার আগে পর্যন্ত বউয়ের চিকিৎসা—সবই সঞ্চিত টাকার সুদেতেই। এই কষ্টের ধন লক্ষ লক্ষ টাকার শেয়ার সার্টিফিকেট ফান্ড তো উত্তরাধিকার সূত্রে আমার ছেলেটারই হবে। ভাবতে অবাক লাগে, সম্পূর্ণ বিনা পরিশ্রমে!

শিবলাল থামিয়ে দিয়ে বললেন, এক্কেবারে ফাউয়া পাওয়া!

অতীন্দ্র হাসলেন। এতক্ষণ কোনো মন্তব্য না করে চুপচাপ থাকলেও মনেপ্রাণে স্বীকার করেন, আজকের আলোচনা থেকে যে নির্যাস বেরিয়ে আসছে তাতে বিন্দুমাত্র খাদ নেই। বরং যথার্থতাই আছে।

আড্ডাটা যখন বেশ জমে উঠেছে সেই সময় একটা গাড়ি এসে সামনে দাঁড়াল।

অতীন্দ্রর চেনা গাড়ি। সেবন্তীর।

অতীন্দ্র বিস্মিত এবং কিছুটা সঙ্কুচিত।

অন্য সবাই বিরক্তিতে তাকালেন। লক্ষ্য করলেন, চালকের আসনে মহিলাটি মুখ বাড়িয়ে এদিকেই কারও দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

আড্ডার একে অপরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন, মহিলাটি কাকে চাইছেন।

কি ব্যাপার তুমি? অতীন্দ্র সবার মনের ধন্দের অবসান ঘটিয়ে বললেন, ফোন করলেই তো পারতে।

সেবন্তী কোনো জবাব দিলেন না। বিস্ময়ে হতবাক্ করে গাড়ি থেকে নেমে একদম আড্ডাস্থলে দাঁড়ালেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে অবিশ্বাস্য সপ্রতিভ প্রশ্ন করলেন,

আমি কি কিছুক্ষণ আপনাদের মধ্যে বসতে পারি? আমিও আপনাদের মতোই একজন রিটায়ারড পার্সন।

অবশ্যই বসতে পারেন। শান্তিময় নির্ভীক বললেন।

বসুন বসুন। সম্মিলিত সকলে আন্তরিক আগ্রহ দেখালেন।

একমাত্র নিরুত্তর নির্বাক অতীন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে সেবন্তী বললেন, অতীনদা তোমাকে ইচ্ছে করেই ফোন করিনি। যেতে আসতে তোমাদের এই আড্ডাটা দেখি। ভাবলাম, আমিওতো তোমাদের মতোই একজন। মেম্বার হয়ে গেলে কেমন হয়। তাই আড্ডাটা দেখতে চলে এলাম।

তা মন্দ কর নাই। শিবলাল খুশি মনে বললেন, এই কথাডাই আমি ভাবতাম। ভাবতাম, মাইয়্যারাওতো চাকরি থিকা রিটায়ার করে। কিন্তু তেনাদের কুনো বুড়াদের আড্ডায় দেখি না ক্যান?

তুই থামতো শিবলাল। এই প্রথম অতীন্দ্র মুখ খুললেন। অসন্তুষ্টি এবং বিরক্তিতে। একটু থেমে সেবন্তীকে আড্ডার সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করালেন। সবশেষে সবার কাছে সেবন্তীর পরিচয় জানালেন এইভাবে, ওর দাদা শোভন হয়তো কারও কারও চেনা হতেও পারে। মারা গেছে। আমার বন্ধু ছিল। একটা বয়সের পর অল্প কয়েক বছরের ছোট বড়দের মধ্যে ব্যবধানটা খুউব একটা থাকে না। সেভাবেই এই বয়সে সেবন্তী এখন আমার বন্ধুর মতো।

তাইলে তো আমরাও হগ্গলে বন্ধু হইয়্যা গ্যালাম। শিবলাল খোলা মনে সেবন্তীর কাছে জানতে চাইলেন, আপনি কি কন?

অবশ্যই, অবশ্যই। সেবন্তী নির্ভেজাল সম্মতি জানিয়ে বললেন, একই খেয়ার যাত্রী আমরা। দিনের শেষের খেয়ার।

সকলেই কম বেশি কাছাকাছি বয়সের। ভক্তিভূষণ বললেন।

এবং হয়তো অনেক কিছুতেই একই রকম দুঃখের দুঃখী। যোগেশ মন্তব্য জুড়লেন।

যেমন অনেকেই আমরা এখন সংসারে থেকেও নেই। বললেন বলরাম।

নিঃসঙ্গতো বটেই। শান্তিময় দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

কিন্তু এ্যাহুনি মরণ চাই না কেউই। শিবলাল বলে অতীন্দ্রর দিকে তাকালেন। ভাবটা এমন যেন—এবার তোর পালা। বল তুই কি বলবি।

অতীন্দ্র কিছুই না বলে নিরুত্তর রইলেন।

সেবন্তী একটু অবাক হলেন। মনে প্রশ্ন উঁকি দিল, তবে কি আমি এখানে এভাবে আচমকা এসে আড্ডায় বসায় ক্ষুব্ধ?

আজ কিন্তু আমি আর বসব না। সেবন্তী আচমকা উঠে দাঁড়ালেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, খুব শিগগির আপনাদের সবাইকে একদিন আমার

বাড়িতে ডাকবো। দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা থাকবে। দিনভোর আড্ডা হবে। আসবেন তো?

নিশ্চয়ই। সম্মিলিত সকলেই সোচ্চার সম্মতি জানালেন, অবশ্যই যাব।

অতীনদা তুমি চুপচাপ? সেবন্তী জানতে চাইলেন।

আমি যে যাব সে তো তুমি ভালোভাবেই জানো। অতীন্দ্র আলতো হেসে বললেন, তুমি কি আমার মুখ থেকেও শুনতে চাও?

ন্নাহ্, ঠিক আছে। সেবন্তী চতুর চাহনির ইশারায় জানতে চাইলেন অতীন্দ্র এখন ওর সঙ্গে যাবেন কিনা।

তুমি কি এখন বাড়িতে ফিরবে? অতীন্দ্র ইংগিতে সায় দিয়ে বললেন, যদি বাড়ির দিকে যাওতো আমি তোমার সঙ্গে যাব। ওদিকে আমার একটু দরকার আছে। সেখানে নেমে যাব।

তাহলে আর দেরি করো না। উঠে পড়ো।

ওরা দু'জন চলে যেতে বলরাম বললেন, দারুণ স্মার্ট। নিজেই ড্রাইভ!

হবে না! শান্তিময় বললেন, ওকে আমি বহুকাল আগে থেকেই চিনি। ভাইবোনদের মধ্যে লেখাপড়ায় সবচাইতে ভালো ছিল। ছেলেটাও ব্রিলিয়ান্ট। এখন ফরেনে থাকে।

কিন্তু মেয়েটার জীবনটা বড় দুঃখের। অল্প বয়সেই স্বামীকে হারাতে হয়েছে।

অতীন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন? যোগেশ জানতে চাইলেন।

তোমার তো বাল্যবন্ধু, জানো না। শান্তিময় বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। ভক্তিভূষণ বললেন, অতীনতো ছোটবেলায় ওদের বাড়িতেই বেশি সময় কাটাতো। একদম ঘরের ছেলের মতো। সে জন্যই হয়তো সেবন্তীর সঙ্গে বিয়ে হয়নি। ঠিকই বলেছে, একটা বয়সে অসম বয়সীরাও অতি সহজেই বন্ধুর মতো হয়ে যায়।

তবে কি জানোস ভক্তি। শিবলাল যথেষ্ট বিজ্ঞের মতো বললেন, আমার ক্যামন য্যান ডর লাগতেছে।

কীসের ডর? যোগেশ অবাক হলেন।

দল ভাঙোনের। শিবলাল নাকে নস্যি নিয়ে বললেন, মাইয়্যারা দলে ঢুকলে আমাগো দল ভাঙতে পারে। এ্যাহনি তো তুই জিগাইলি অতীনের লগে মাইয়্যাডার সম্পর্ক ক্যামন? এই জিগানটা য্যান ক্যামন ক্যামন ঠ্যাকলো।

ঠিক বলেছিস শিবা। ভক্তিভূষণ সহমত হয়ে বললেন, এরপর হয়তো একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করবে। তারপর যদি সত্যি সত্যিই সারাদিনের জন্য ওর বাড়িতে আড্ডা আর ভুরিভোজ হয়। তাহলে—

তাহলে কি? ভক্তিভূষণকে চুপ হয়ে যেতে দেখে শান্তিময় জিগ্যেস করলেন।

অনেকেই গোপনে একা যাতায়াত শুরু করতে পারে। ভক্তিভূষণ সতর্কতার সঙ্গে বললেন, হয়তো তেমন কিছু হল না।-কিন্তু সন্দেহ বলে কথা। হয়তো দেখা গেল কেউ কোনোদিন আড্ডায় গরহাজির। যেটা নানা কারণে এখনো হয়। তখন কিন্তু অনেকেই ভাবতে শুরু করবে, কি জানি ওর ওখানে যায়নি তো।

কাজকাম না থাকলে বুড়া বয়সে যা হয় আরকি। শিবলাল আলোচনার আবহাওয়া হাল্কা করতে বললেন, তবু আমি চাই মাইয়্যাডা আমাগো দলে থাউক। বার মাইস্যা আলুনি আলুনি স্বোয়াদটা কাটন দরকার।

তুইতো তা চাইবিই। ভক্তিভূষণ ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, আলুর দোষটা তোর চিরকালের। ঘরে দজ্জাল বউ। পাত্তা পাস না সেখানে।

তর বউডাই বা কী! শিবলাল পাল্টা আক্রমণ করে বললেন, বার মাসে তের উপাস। যহনি যাই ঠাকুরঘরে। নইলে নাতি নাতিন সামলায়। তর সাথে কথা কওয়ার টাইম পায় কখন।

আমি ভাই এবার না বলে পারছি না। যোগেশ দু'জনকে থামিয়ে দিতে বললেন, এই বয়সে কার কত কথা হয় বউয়ের সঙ্গে? এক যারা শুধুমাত্র বুড়ো বুড়ি থাকে তারা ছাড়া আর কেউই তেমন কথা বলার সময় সুযোগ পায় না। তাছাড়া কথা বলার আছেটাই বা কি!

এখানেও তাই। বলরাম আক্ষেপ করলেন, নতুন কিছু কথাবার্তা হয়? সেই তো একই ঘরোয়া সুখ দুঃখের কথা ঘুরে ফিরে আসে। নয়তো রোজকার খবরের কাগজের খবর নিয়ে কচকচানি।

ক্যান, আমাগো লোকাল রিপোর্টার যোগেশও তো কম কিছু না। শিবলাল খোঁচা দিয়ে বললেন, অর লইগ্যাইতো এহানকার, ঘরে ঘরের কিস্‌সা খবর পাইয়া থাকি। ঝাল চুকা মিষ্টির স্বোয়াদ পাই।

শিবলালের খোঁচায় যোগেশ অসন্তুষ্ট হলেন না। বরং স্মিত হাসলেন। গর্ব করে বললেন, আমার দেয়া কোনোও খবরই কিন্তু ভুয়ো না। সেম পার্সেন্ট জেনুইন।

সেটা অবশ্য ঠিক। শান্তিময় সমর্থন করে বললেন, শুধু কেচ্ছা বললে ভুল হবে। অনেক কিছু জরুরি বিষয়ের সংবাদই তো আমরা প্রয়োজনে ওর কাছ থেকে জেনে নেই। যেমন সর্বত্র ব্যর্থ হয়ে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসই খুঁজে পাওয়া যায় চাঁদনিচকে। তেমনি কোথাও জরুরি দরকারি পরিষেবা সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারলে শেষমেষ যোগেশবাবু আছেন।

আসলে আমার ভিতর একটা সাংবাদিক মন আছে। যোগেশ কিছুটা উদাস হলেন, ইচ্ছাও ছিল সাংবাদিক হওয়ার। পারলাম কোথায়? এই দেশটাই এমন। মন মানসিকতার অনুকূল চাকরি পাবেন না। সারাজীবন চাকরি করলাম কোথায়? দমকলে।

একটু থেমে যোগেশ ফের বললেন, খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে সিংহভাগ মানুষই আমার মতো অপছন্দ বৃত্তিতে ছিল এবং এখনও আছে।

ডোন্ট বি সো ইমোশনাল! বলরাম বললেন, এখন বুঝতে পারছি এত সংবাদ সংগ্রহের উৎসটা কোথায়। এতকাল আমরা অনেকেই ভুল বুঝতাম। এই যেমন কিছুক্ষণ আগে অতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে মহিলাটির সম্পর্ক কেমন? প্রশ্ন শুনে অনেকেই ভুল বুঝেছেন। এখন আমি অন্তত বুঝতে পারছি মহিলাটির ব্যতিক্রম কিছু আচরণই সাংবাদিক মনে ওরকম প্রশ্ন জাগিয়েছে।

ধন্যবাদ বলরামবাবু। যোগেশ খুশি হয়ে বললেন, আপনি অন্তত আমাকে বুঝতে পেরেছেন।

এভাবেই বিকেলের আড্ডা সন্ধ্যা অব্দি গড়াল।

মশার দংশন বলতে শুরু করল, এবার বুড়ো তোমরা উঠে পড়। অন্ধকারে এবার যুবক যুবতীরা জোড়ায় জোড়ায় আসবে। সাইকেল অথবা মোটর বাইকে চেপে।

উঠতে একটু দেরি হলে ওদের অশালীন মন্তব্যের দংশনও কম না। মশার চাইতে বেশি অসহনীয়।

আড্ডা ভেঙে যেতে এক একজন ভিন্নতর পথে পা বাড়ালেন।

।। সাত।।

তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো অতীনদা?

রেল সেতুর ওপর থেকে অতীন্দ্রকে তুলে নিয়ে আসার সময় পথে সেবন্তী জিগ্যেস করলেন। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বললেন, রাগ তুমি করতেই পার। বিশ্বাস কর নিজেকে এত বেশি একা নিঃসঙ্গ লাগছিল যে—

যে কি? অতীন্দ্র থামিয়ে দিয়ে বললেন, রাগ অভিমান করা চলে ভালোবাসার জনদের ওপর। আমি যে তোমার ওপর রাগ করেছি, কে বলল?

রাগ করলে কেউ আবার বলে নাকি যে, আমি রাগ করেছি। সেবন্তী এক চিলতে হেসে বললেন, বুঝে নিতে হয়। বুঝে নিয়েছি। আমি যে তোমার ভলোবাসার জন—সেটাও বুঝি।

সেটা কেমন করে?

সবকিছুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলে না। তোমার ভালোবাসাটা আজকের নয়—সেই যখন আমাদের বাড়িতে যেতে তখন থেকেই। মার কাছে সন্তানতুল্য। দাদার কাছে তুমি বিশ্বস্ত বন্ধু। সেই মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের মনকে সংযত করেছো। আমি তোমার মহত্বকে অস্বীকার করছি না।

এসব কথা আজ আসছে কেন? অতীন্দ্র প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে বললেন, অতীত

প্রসঙ্গে আলোচনায় না যাওয়াই ভালো। এমন একটা বয়সে এসে দাঁড়িয়েছি যে সময় ভাবনাটা ভিন্নতর এবং অন্যমুখি হওয়া দরকার।

আমিও তো বাকি জীবনটাকে অন্যমুখিই করতে চাই। সৃজন আমাকে তেমন কিছু করতে সাহায্য করছে।

ঠিক বুঝলাম না। অতীন্দ্র সকালের এস এম এস প্রসঙ্গ টেনে এনে বললেন, তোমার মানসিক অবস্থা যে কোনোও কারণে ঠিকঠাক নেই তা তখুনি টের পেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে কারণটা তোমার সৃজন বিষয়ক। বলতে বাধা না থাকলে বল শুনি। তাতে হয়তো কিছুটা মেঘমুক্ত হলেও হতে পার।

তার আগে বল, তুমি কি সত্যিই পথে কোথাও জরুরি কাজে নামবে?

ন্নাহ্, না। অতীন্দ্র এই প্রথম প্রাণখোলা হাসলেন। আন্তরিক নরম স্বরে বললেন, ওটাতো আড্ডার ওদেরকে শোনাতে বাহানা ছিল। সকালেই তো এস এম এসে জানিয়েছিলাম, চাইলে তোমার বাড়িতে আসতে রাজি আছি। ভেবে দেখে জানাবে বলে কিছুই তো জানালে না সারাদিন। বিকেলে আড্ডায় আসার আগেও তোমার মোবাইলে চেষ্টা করেছি। প্রতিবার শুনতে হয়েছে... কারেন্টলি নট এ্যাভেলেবেল।

এখন তো সশরীরে এ্যাভেলেবেল। সেবন্তী গাড়ির গতি অন্যমুখি করলেন।

এখন ওরা দুজনে নদীর ধারে চুপচাপ বসে।

সেবন্তী এতক্ষণ সৃজন-কীর্তি ইনটারন্যাশানাল লাভ এ্যান্ড লিভ সংস্থার চমকপ্রদ ব্যবস্থাপনার বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। বিস্মিত হতবাক্ অতীন্দ্র।

গাছগাছালিতে আবছা অন্ধকারের ডানায় সন্ধ্যা নামছে। দূরে চলমান দু-একখানা জেলে ডিঙি নৌকা ক্রমশ ধূসর হয়ে আসছে।

চারদিকের নিঃশব্দের ভিতর শুধু পাড়ে এসে পড়া জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। জোয়ারের জল পা ছুঁই ছুঁই।

আকাশে এক এক করে কয়েকটা তারা উঁকি দিয়েছে। একটু পরে হয়তো চাঁদ উঠবে। রূপোলী জ্যোৎস্না ছড়াবে।

শীতল নিস্তব্ধতা চূর্ণ করে অতীন্দ্র প্রথম মুখ খুললেন। সেবন্তীর কাছে জানতে চাইলেন, অন্যমুখি বলতে জীবনটাকে তুমি এখন কিরকম করতে চাও?

সেবন্তী তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দিলেন না। অতীন্দ্রকে নিয়ে নিজ গৃহমুখী হলেন।

দুজনে বাড়িতে ফিরতেই লোডসেডিং হল।

সেবন্তী প্রথম মোম জ্বালালেন। তারপর সেই আগুন থেকে হ্যারিকেন। স্বল্প আলোয় কোনোমতে দু'কাপ কফি করে বললেন, স্যরি অতীনদা। কারেন্ট না আসা অব্দি তোমাকে অন্য কিছু করে খাওয়াতে পারছি না।

তুমি বললে নাতো, কি করতে চাইছো তুমি? কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অতীন্দ্র বললেন, দ্রুত বদলে যাওয়া জগতে এই ঘটনা কিন্তু অনুভবের তরফ থেকে আমাদের জীবনেও ঘটতে পারে। তাই তোমার ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনাটাও একত্রিত করতে চাই।

শুধু আমার তোমার নয়। সেবন্তী অত্যন্ত একনিষ্ঠভাবে বললেন, তোমাদের আড্ডার সবাইকেও যুক্ত করতে হবে। সে জন্যই আমি আজ গিয়েছিলাম এবং ওদেরকে আমার বাড়িতে একদিন সমবেত হওয়ার আগাম নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি।

কিন্তু তোমার প্ল্যান প্রোগ্রাম কি বলবে তো আমাকে?

নিশ্চয় বলব। সেবন্তী চোয়াল শক্ত করে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, তোমাদের সকলের প্রস্তাব মতামতও শুনব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব। আমার বিশ্বাস, সাফল্য আমাদের আসবেই।

অতীন্দ্র ধৈর্য হারিয়ে আর কোনো কথায় গেলেন না। নিরুত্তর কফি পান শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন। অনেকদিন পর আজ পাঁচটা কিনেছিলেন। তারই একটা ঘন ঘন ধোঁয়া ওড়াতে থাকলেন। নির্বাক।

কিছুক্ষণ পর সেবন্তী ফের শুরু করলেন, বৃদ্ধাবাস কাশীবাস স্বর্গবাস—এসবে আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। তোমাদের ওই নিষ্কর্মা আড্ডাও আমার অপছন্দ। একটা মানুষের রিটায়ারমেন্টতো চাকরি থেকে। কর্মময় জীবনক্ষেত্র থেকেতো নয়। তাহলে কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে কেন?

তুমি মিসট্রেস ছিলে, তাই এখনও প্রাইভেটে পড়াতে পার। অতীন্দ্র নিজের প্রসঙ্গ টেনে এনে বললেন, সরকারি পদস্থ আমলা হিসেবে চাকরি শেষে আমার পক্ষে কি কাজ করা সম্ভব? তাছাড়া যেহেতু আমি পেনসন সুবিধা ভোগ করছি তাই আমার পক্ষে চাকরি করায় অসুবিধা আছে।

চাকরি কেন করবে? সেবন্তী প্রতিবাদ কণ্ঠে বললেন, মানুষ চাকরি করে জীবন-ধারণের জন্য। রুজি রোজগার দরকার হয় সংসারের প্রয়োজনে। বেঁচে থাকার নিরাপত্তার মুখ চেয়ে। সেসব চাহিদা প্রয়োজন এখনোও যাদের আছে তারা নিশ্চিত কিছু না কিছু একটা করছেই। আমার স্বপ্ন তাদের বাইরের বাকিদের নিয়ে।

কি সেই স্বপ্ন? অতীন্দ্র ফের জানতে চাইলেন।

দাতব্য চিকিৎসা, অবৈতনিক বিদ্যাদান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ইত্যাদি সমাজসেবা। সেই সঙ্গে বয়স্কদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা সহৃদয়তার বন্ধন। এই পর্যন্ত বলার পর সেবন্তী ভাবাবেগে কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন।

তারপর আবার বললেন, জগত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমরাইবা অপরিবর্তিত থেকে দুঃখ ডেকে আনতে যাব কেন? আজীবন সন্তানাদিতে সীমাবদ্ধ থাকাই আমাদের

দুঃখের অন্যতম কারণ। কাজের এই সীমাবদ্ধতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অন্যমুখি হতে হবে।

লোডসেডিং শেষ হয়ে আলো জ্বলে উঠতে সেবন্তী কথা থামালেন। হ্যারিকেনের আলো নিভিয়ে ঘরে বাইরের আলোগুলি জ্বালিয়ে ফ্যান চালালেন। তারপর সোজা রান্নাঘরে গেলেন।

অতীন্দ্র খোলা জানলা দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন, নদীর দিকটাতে দূরের আকাশে তারাগুলি উধাও। আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ রেখা ঝিলিক দিচ্ছে।

হঠাৎই দূর থেকে শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে এলো। বুঝতে অসুবিধা হলো না, দুরন্ত বেগে ঝড় আসছে।

ঝড় যে আসছে সেটা টের পেয়ে সেবন্তী ছুটে এসে প্রতিটি ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করলেন। ঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার আশঙ্কায় ফের একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখলেন।

সাবেকি ইটকাঠের শক্তপোক্ত বাড়ি হলেও বন্ধ ঘর থেকে অতীন্দ্রর মালুম হচ্ছিল, বাইরে প্রবল জলঝড় হচ্ছে। সেই সঙ্গে কাঁপিয়ে দেয়া কান ফাটানো বজ্রপাতের শব্দ।

অতীন্দ্র ভাবছিলেন, বাড়ি ফিরবেন কেমন করে! এখান থেকে বাস-রাস্তার দূরত্ব নেহাত কম নয়।

সেবন্তী ডিমের ওমলেট আর মিষ্টির প্লেট সামনে রেখে জিগ্যেস করলেন, চা কফি কিছু খাবে আর একবার?

কর।

চা না কফি?

যা খুশি। চা করলে শুধুই লিকার। খেতে খেতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দুধ চা আর ভালো লাগে না।

লিকার চা করে এনে সেবন্তী বললেন, অসুবিধা না থাকলে রাত্রে থেকে যাও। খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াব। থাকবে?

থাকাথাকি আকাশের অবস্থা দেখে ভাবা যাবে। অতীন্দ্র এমন বাদলে লোভ সামলাতে না পেরে বললেন, খিচুড়ি তো খাই আগে।

সেবন্তী যেভাবে মশলাপাতি দিয়ে খিচুড়ি তৈরি করেন তাতে হ্যাপা অনেক। তাই সময় নষ্ট না করে প্রস্তুতিতে গেলেন।

যাবার আগে বললেন, তুমি ততক্ষণ ম্যাগাজিন জার্নালগুলি পড়। তারপর দেয়াল জোড়া বিশাল বিশাল আলমারিতে সাজানো বইগুলি দেখিয়ে বললেন, ইচ্ছে হলে ওখান থেকে বই নিয়েও পড়তে পার। চাবি দেয়া নেই। তা ছাড়া টিভিতো আছেই।

শেষোক্ত এই জিনিসটা অতীন্দ্রর খুবই অপছন্দ।

কিসব যাচ্ছেতাই অনুষ্ঠান হয় দিনভর। অনেকে বলে, বোকা বাক্স। দোষতো বাক্সটার না। ভেতরে পাঁচ রকম মশলা গুঁজে যেসব রান্না পরিবেশন করা হয় সেইসব কারিগরদের।

সেদিন আড্ডায় ভক্তিভূষণ তর্কে বলছিল, দর্শকতো খাচ্ছে। খাচ্ছে তাই দিচ্ছে। ওদের দোষটা কোথায়?

খাচ্ছে মানে কি? টিকিট কাটতে হলে ক'জন আর খেত। অধিকাংশই ফ্লপ করত। বিনা টিকিটের বিনোদন বলেই কেউ ছাড়ছে না। নিমন্ত্রণের ভোজে মানুষ যেমন আকণ্ঠ খায়।

অতীন্দ্রর ভাবতে অবাক লাগে, আজকের দিনে সচেতন শিক্ষিত কুমারী মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে কেমন করে। অধিকাংশ টেলিফিল্ম আর সিরিয়ালেই তিন মাসের গর্ভবতী একটি কুমারী মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। দিনের পর দিন তার প্যান প্যানানি কান্না অসহ্য। যুগ পাল্টেছে তা বোঝা যায় না, যখন সে হাজার সমস্যা জেনেও কুমারী মা হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কার পেটে যে কখন কার বাচ্চা জন্মাচ্ছে তার কোনো হিসেব নেই।

একটা জিনিস পরিষ্কার, অবাধ যৌন মিলনের প্ররোচনা থাকলেও বিয়ে করে সংসারি হওয়ার স্বপ্ন থাকে না অধিকাংশ কাহিনীতেই।

কি যে পায় মণিমালা সারাদিন!

অতীন্দ্র সুযোগ পেলে ছোটদের জন্য অনুষ্ঠানগুলি দেখতে ভালোবাসেন। আড্ডায় সকলের ঘরের কথায় জানা গেছে, ওই অনুষ্ঠানগুলি নাকি বয়স্করাই বেশি দেখে। তাহলে ছোটরা? ওরা দেখতে ভালোবাসে ফিল্মি নাচের দৃশ্যের সঙ্গে বাজার গরম করা গানের প্রোগ্রাম। যা কিনা সঙ্গে দেখতে বসলে ওদের বদলে বয়স্করাই অস্বস্তিবোধে উঠে পড়ে।

সেদিন যোগেশ বলছিল, ওর কাছে বিশ্বস্তসূত্রে খবর আছে কোন কোন অঞ্চলে অধিক রাতে নাকি লোকাল কেবিলে নীলছবিও দেখানো হয়। সপ্তাহের নির্দিষ্ট কোন দিনে। থানার সঙ্গে বোঝাপড়া করেই।

সেবন্তী এসে পড়ায় অতীন্দ্রর ভাবনায় ছেদ পড়ল। এতক্ষণে খেয়াল হল, বাইরে এখন ঝড় নেই। নরম নিস্তেজ শব্দের বৃষ্টি চলছে। গাছের পাতার ওপরকার অন্য সুরের শব্দটা বেশ মধুর লাগল।

খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে এলাম, বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। কাপড়ের আঁচলে হাত মুছে সেবন্তী জিগ্যেস করলেন, রাত্রে থাকবে তো?

ভাবছি। অতীন্দ্র আনমনা উত্তর দিলেন।

এত ভাববার কি আছে? সেবন্তী অবাক হয়ে বললেন, পিছু টান কিসের?

ভাবনাটাতো সেখানেই। অতীন্দ্র কারণটা ব্যাখ্যা করলেন, এখানেইবা এমন কিসের টান আছে যে আমি রাত কাটাতে থেকে গেলাম। এর আগেও একরাত কাটিয়ে গেছি। দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ। তারপর রাতের পর রাত একটা বাড়িতে শুধু আমরা দু'জনে। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে—ভেবে দেখেছো?

একটা প্রশ্ন করব অতীনদা, যদি তুমি কিছু মনে না করো। সেবন্তী মুচকি হেসে পলকহীন তাকালেন। তারপর ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, তুমিতো আড্ডায় বললে, আমি এখন তোমার বন্ধুর মতো। কাজেই প্রশ্নটা করতেই পারি। তবু তোমার অনুমোদন চাইছি।

বেশতো কিছু মনে করব না। বলে ফেলো।

তুমি আর বৌদিতো আজকাল দিনরাত একই সঙ্গে বাড়িতে থাক। রাতের পর রাত একই বিছানায়। কিন্তু এই বয়সে তোমাদের সম্পর্কটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ ত্রিশ বছর আগেকার অবস্থায় নেই নিশ্চয়ই?

সেটাই তো স্বাভাবিক। আগেকার মতো হলে কি তোমার বৌদি এতদিন চেন্নাই গিয়ে থাকতে পারত! নাকি আমি ওকে ছাড়তাম?

আমার বয়সটা বৌদির চাইতে কম কিসের? সেবন্তী উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে বললেন, তবু ব্যাপারটা কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে পারে ভাবছো কেন?

ভাবনাটা যে কোথায়—

মোবাইলে রিং টোন হতে অতীন্দ্র থেমে গিয়ে বললেন, বল সতু কি বলছিস।

তুই এখন কোথায়? ওপার থেকে সতীন্দ্র জানতে চাইল।

এক বন্ধুর বাড়িতে। কেন?

কোন্ বন্ধু?

কেন বলতো।

ফিরবি কেমন করে? ঘরে বসে আছিস তাই হয়তো টের পাসনি। ভয়ানক ঝড়ে চারদিকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে। গাছের পর গাছ ল্যাম্পপোস্ট পড়ে রাস্তা বন্ধ। কোনো গাড়ি ঘোড়া চলছে না। ওভার হেডের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ট্রেনও বন্ধ। আমাদের পাড়াতেও এখন আলো নেই।

তাই বুঝি। আমিতো কিছুটি বুঝতে পারিনি।

রাস্তায় বেরিয়ে বিপদে পড়তে পারিস ভেবেই ফোন করছি। যে বন্ধুর বাড়িতে আছিস ওদের অসুবিধা না থাকলে রাত্রে ওখানেই থেকে যা। রাখছি।

সতীন্দ্রর ফোনের বৃত্তান্ত শুনিয়ে অতীন্দ্র বললেন, তোমার প্রশ্ন উত্তরের ইতি টানতে পার। বেশি ভাবাভাবি করেও যে অনেক সময় কাজের কাজ কিছু হয় না তার জ্বলন্ত প্রমাণ, আজ এখানে অনিবার্য রাত্রিবাস।

ফের ডিমের ওমলেট! খিচুড়ি খেতে বসে অতীন্দ্র বললেন, শুধু আলু ভাজাই যথেষ্ট ছিল।

খাওতো, কিছু হবে না। সেবন্তী বললেন।

নতুন ধরনের স্বাদ পাচ্ছি। অতীন্দ্র নির্ভেজাল তারিফ করে বললেন, দা-র-উ-ন রেঁধেছো।

বৌদির চাইতেও ভালো? সেবন্তী জানতে চাইলেন।

তুলনা টানবে নাতো। অতীন্দ্র শাসন-স্বরে বললেন, তোমরা মেয়েরা বড্ড তুলনা টানতে ভালোবাসো। এটা ঠিক না। গুণে যে যার নিজের মতো। রান্নাতেও কম বেশি সকলেরই কিছুটা নিজস্বতা থাকে। থাকে স্বাদের বৈচিত্র্য।

পুরুষরাও যে তুলনায় যায় না, তা কিন্তু নয়। সেবন্তী প্রতিবাদি কণ্ঠে বললেন, পুরুষরা আগ বাড়িয়ে সবকিছুতেই কান দিতে বড্ড বেশি ভালোবাসে। বিশেষ করে মেয়েদেরকে। মজ্জায় মজ্জায় মেয়েদেরকে খাটো করে দেখা অভ্যেস।

বড্ড বেশি বলে ফেলছো না? অতীন্দ্র আবার সমালোচনা করে বললেন, এই বেশি বলাটা অনেকেরই কুঅভ্যেস।

যেমন তোমার। সেবন্তী রসিকতা করে হাসলেন।

বেশতো, আমি তাহলে মুখ বন্ধ করলাম। অতীন্দ্র চুপচাপ খাওয়ায় মন দিলেন।

এই সুযোগে সেবন্তী ওর স্বপ্ন-দেখা পরিকল্পনাটা অতীন্দ্রকে বিস্তারিত শোনালেন।

সেবন্তী ধরেই নিয়েছেন সৃজন আর কোনোদিনই বরাবরের জন্য দেশে ফিরে আসবে না। চাকরি জীবনের শেষে যদি দেশে ফিরেও আসে মফঃস্বলের এই সাবেকি বাড়িতে থাকবে না। বাড়িটা বিক্রি করে দেবে।

তেমনিতোই হচ্ছে আজকাল। এক দুই সন্তানদের সময়ে উত্তরাধিকারসূত্রে দুটো বাড়ির মালিক দু'জনে। একটা বাড়িতো বিক্রি হবেই।

সেবন্তীর ভাবনাটা অন্যরকম।

বিশাল এই বাড়িটা দশের কাজে লাগাতে চান সেবন্তী।

সেটা কিরকমভাবে?

অতীন্দ্র জানতে চাইলে বললেন, আজকালতো পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি উঠেই গেছে। একটা লাইব্রেরি করা যায়। যোগ ব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্র করা যায় একটা। লাভ লোকসান বিহীন ডায়গনেস্টিক সেন্টার খোলা যায়। দরিদ্রদের জন্য সপ্তাহে এক দু'দিন হোমিও ডাক্তার বসানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিরক্ষরতা দূর করতে রিটায়ার্ড পার্সনরা ক্লাস নিতে পারেন। অভাবী মেয়েদেরকে স্বনির্ভর করে তুলতে নানারকম হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করা এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার না। এমন কি দুচার ঘর অনাথ-আশ্রয়ও সম্ভব। আরও অনেক কিছুই সম্ভব। যদি অবশ্য নিষ্কর্মা রিটায়ার্ড মানুষগুলি সামিল হতে ইচ্ছুক হন তবেই। কেননা লোকবল একটা বিরাট ফ্যাক্টর। সেই সঙ্গে বিনা পারিশ্রমিকের ব্যাপারটাও নির্ভর করছে।

বুঝলাম। অতীন্দ্র আর্থিক দিকটার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, বিরাট ব্যয়ভার বহনের ব্যাপার স্যাপার। এত টাকা আসবে কোত্থেকে?

একটু কাজ করে দেখাতে পারলে পরে স্পনসার পেতে অসুবিধা হবে না। প্রথম দিকের সমস্যাটা রিটায়ারমেন্টের বন্ধুদেরকেই মেটাতে হবে। তোমার কি মনে হয়, ওদের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যাবে না?

সেটা আমার পক্ষে বলা মুশকিল? অতীন্দ্র কিছুটা নিরাসক্তিতে জবাব দিলেন, কার মন কেমন তা বুঝবো কেমন করে।

ওদের মন না হয় আমি যাচাই করে নেব। সেবন্তী যেন পরিকল্পনামতে কাজে নেমেই পড়েছেন এমন ভাবে চনমনে আবেগে বললেন, আপাতত তোমাকে সঙ্গে পেলেই আমার কাজ শুরু করা চলবে। সঙ্গে পাবতো তোমাকে?

কি করতে হবে আমাকে?

আপাতত প্রতিদিন বিকেলে নিষ্কর্মা আড্ডাখানার পরিবর্তে আমার এখানে চলে আসবে।

আসলাম। তারপর?

আগে তো হাজিরাটা অভ্যাস কর। তারপর দেখা যাবে।

সেবন্তী ইচ্ছে করেই পরবর্তী পদক্ষেপ এক্ষুনি অতীন্দ্রকে ব্যক্ত করলেন না। আসলে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সময়ে এখন ওর মন মানসিকতা কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তা এখনো জানা হয়নি।

সেবন্তীর অভিজ্ঞতা মোটেই আশাপ্রদ তেমন কিছু না। লক্ষ্য করেছেন, বৃদ্ধ বয়সে যারা সন্তানের কাছে অবহেলিত তাদের অধিকাংশরাই দুঃখ কষ্ট পেয়ে থাকেন নিজেদের দোষে। ভুলে যান, বাড়িটা তার নিজের। জীবিত অবস্থায় না দিলে কোনোও সন্তানই অধিকার দাবি করতে পারে না, যদি না সম্পত্তিটা পিতৃপুরুষের হয়। শত লাঞ্ছনা অবহেলা সত্ত্বেও অধিকাংশরাই তার বিষয় আশয় ধন সম্পত্তি পরহিতে দান করতে চান না।

সেবন্তী এই জায়গাটাতেই ঘা মারতে চান। সনাতন সেই কথা বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে, সময়ে আপন থেকে পর ভালো। পরের চাইতে বন ভালো।

সেবন্তী দাঁতে ঠোঁট কেটে নিরুচ্চার বললেন, 'ইন্টারন্যাশানাল লাভ এ্যান্ড লিভ' দরকার নেই আমার। পর আর বনই শ্রেয়ঃ।

রাত্রে মোবাইলের সুইস অফ করার আগে ফের একবার রিংটোন হল।

অতীন্দ্র অবাক হয়ে দেখলেন, নম্বরটা তপেন্দ্রর ল্যান্ড ফোনের।

ওপার থেকে স্নিগ্ধার কণ্ঠস্বর শুনে জিগ্যেস করলেন, এত রাত্রে কি ব্যাপার!

আপনিতো আজ বাড়ি ফিরতে পারেননি বোধহয়। একটু আগেও একবার গিয়েছিলাম।

দেখলাম তালা বন্ধ।

দরকার ছিল কিছু?

তেমন কিছু না। আলো ছিল না তো। আসলে দেখতে গিয়েছিলাম ঝড়ে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। সঙ্গে একটু খিচুড়িও ছিল।

এখানেও আজ খিচুড়িই খেলাম।

তা হোক। ফ্রীজে রেখে দিচ্ছি। আপনার নাম করে রাখাতো। আপনিতো বাসি খিচুড়িও ভালোবাসেন। কাল দিয়ে আসব।

ঠিক আছে। কি দেখলে—আমার বাড়িতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নিতো?

বুড়ো পেঁপে গাছটা যা ভেঙে পড়েছে। আর সব ঠিকই আছে।

ওকে। থ্যাঙ্কস্ ফর ইউর ইনফরমেশন।

মোবাইলের সুইস অফ করে অতীন্দ্র দেখলেন, সেবন্তী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন। এক চিলতে হেসে জানালেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর ফোন। ইদানিং ওর বড়দিভাই-এর এক নম্বরের চামচা হয়েছে। ভীষণভাবে আমার খোঁজ খবর নেয়। দেখভাল করে। খিচুড়ি নিয়ে গিয়েছিল আমার জন্য।

সেতো শুনলাম। সেবন্তী ঠোঁট বাঁকিয়ে প্রশ্ন জুড়লেন, সতুর বউ দেখভাল করে না?

করে। নবনীতা যেটুকু যা করে নিঃস্বার্থে। আন্তরিক।

আর ছোট বউ? সেবন্তী কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

কিছুটা করে মণিমালার চামচা হিসেবে। অনেকটাই ভণ্ডামিতে বাড়াবাড়ি। বাকিটা করে নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যেটা একসময় করেছে সতীন্দ্রদের সঙ্গে। এখন ওদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমার দিকে।

স্বার্থটা কোন্দিক থেকে?

ব্যবসায় অনেক সময় বড় অংকের টাকা দেনা করা দরকার হয়ে পড়ে। সেটা যোগান দেয়া একা আমার পক্ষেই সম্ভব। তাছাড়া, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো।

আচমকা থেমে গিয়ে অতীন্দ্র ফের বললেন, থাক ওসব কথা। তুমি বরং এখন ঘুমোতে যাও।

।। আট।।

সৃজন সৃজন সৃজন।

সেবন্তীর একমাত্র সন্তান সৃজন কৈশোরে পিতৃহীন।

যে কদিন তাকে পেয়েছিল বাবার মতো পায়নি। শুধুমাত্র টাকা দিয়েই পিতৃ কর্তব্যে ইতি টেনেছে।

ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা যেমনটি হয়ে থাকে।

সৃজনের কাছে সেবন্তীই ছিলেন মা বাবা—সব কিছু। মা অন্ত প্রাণের সেই ছেলে এমন বদলে গেল!

সেবন্তী শত চেষ্টা করেও পাওয়া আঘাতটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। মানেন, সমস্ত পৃথিবীই অতিদ্রুত বদলে যাচ্ছে। তাইবলে মায়ের প্রতি পুত্র-কর্তব্য পালনের এমন বিচিত্র ব্যবস্থা। আর সেই অবিশ্বাস্য ব্যবস্থাটা করেছে কে? সৃজন।

সেবন্তী প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন, ব্যবসায়ী পরিবারের মন মানসিকতা ঘরানা যেন সৃজনের ওপর প্রভাব ফেলতে না পারে। ওকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন। বিদেশে চাকরি করা ছেলের বাবা মা-দের দারুণ গর্ব। চেনা জানা অনেকেই এমন গল্প শোনায় যেন বিরাট কিছু ব্যাপার স্যাপার।

সেবন্তীর মনে গোপন স্বপ্ন ছিল, সৃজনকে বিদেশে যাওয়ার উপযুক্ত করে তুলবেন। মনে হতো, দাগী মন্ত্রীদের নোংরা রাজনীতির এই মেকি গণতান্ত্রিক দেশে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই।

সেবন্তীর ধারণা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাংলা মাধ্যম স্কুলের ছাত্ররাই বেশি সফল। তবু সৃজনকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করেছিলেন বাধ্য হয়ে। কেননা, বাংলা মাধ্যম স্কুলে তখন মাতৃদুগ্ধ পান করানোর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি বাদ দিয়ে উচ্চশিক্ষা? অসম্ভব।

ইংরেজি মাধ্যমে স্কুলের সংখ্যা কম না হলে কি হবে, ভালো স্কুলতো হওয়া চাই। চাইলেই তো আর যে কোনোও স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব না। হোক না কেজি, একাধিক স্কুল থেকে ফর্ম তোলা জমা দেয়ায় কি কম হ্যাপা। তারপর আছে ছাত্রর পরীক্ষা। অভিভাবকদের ইন্টারভ্যু।

রেজাল্ট বের না হওয়া অব্দি টানটান টেনশন।

সৃজনকে প্রতিদিন অন্ধকার ভোরে স্কুল-বাস ধরাতে হতো। তার আগে বিস্তর প্রস্তুতি। ওকে পোশাক পরানো খাওয়ানো টিফিন বক্স ওয়াটার বটল ছাতা বইপত্র গুছিয়ে স্কুল ব্যাগে ভরা।

নিচু ক্লাসের ছুটি হতো অনেক আগে। স্কুল-বাসে ফিরতে হলে ওইটুকু ছেলে অতক্ষণ একা থাকবে কোথায়। অনেক মায়েরাই স্কুলের সামনে গাছতলায়, গৃহস্থ বাড়ির সিঁড়িতে বসে থাকত।

সেবন্তীর সেই সময় কোথায়। রোজ রোজ স্কুল থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্বস্ত লোক না পাওয়া অব্দি অনেক ছুটি কাটা গেছে।

আর দশজনের মতো ছেলেকে নিয়ে সেবন্তীরও স্বপ্ন ছিল। ভালো রেজাল্ট চাকরি আর সুপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সেজন্য ভালো স্কুল টিচার কলেজ অধ্যাপক বইপত্রের কোনোও ঘাটতি রাখেননি সেবন্তী।

সেবন্তী জানতেন, লেটার, স্টার পাওয়াটা বড় কথা না। প্রতিযোগিতার

পরীক্ষাতেই আসল পরিচয়। প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একজন অভিজ্ঞের অধীনে থেকে পড়াশুনো দরকার। অনেক খরচের ব্যাপার। তখন তো আর স্কুলে পড়ানোয় এখনকার মতো এত বেতন ছিল না। তবু ত্রুটি রাখেননি সেবন্তী।

সেই সময় মা ছেলে দুজনেই সদাব্যস্ত। একজন নিজের পড়া পড়তে। পরীক্ষার প্রস্তুতিতে। অপরজন স্কুলে পড়াতে আর পরীক্ষার খাতা দেখতে।

তারপর বি ই কলেজে পড়ার সময়? কাউনসেলিং এ্যাডমিশন টেস্টেই কি কম উদ্বেগ দুর্ভাবনা।

স্কুলের শিক্ষিকা চন্দ্রাবলী সবসময় আশা ভরসা দিতেন। চিন্তিত আনমনা দেখলেই বলতেন, একদম টেনশন করবেন না। দেখবেন, আপনার ছেলে ভালো রেজাল্ট করবে। ভালো চাকরি করবে। অল্প বয়সে মা হারানো সন্তানেরা অনেকেই হয়তো বখে যায়। কিন্তু অল্প বয়সে পিতৃহীন সন্তানরা অধিকাংশই দারুণ ভালো হয়ে থাকে। ছোটবেলা থেকে মার কষ্ট দেখে বড় হয় বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবসময় মাকে কষ্টমুক্ত রাখতে চেষ্টা করে। বাবা বেঁচে থাকলে কিন্তু এমনটি হয় না। যা বলছি মিলিয়ে দেখে নেবেন।

সেবন্তী চেনা জানাদের ক্ষেত্রে মিলিয়ে দেখেছেন, চন্দ্রাবলীর অভিজ্ঞতার ভবিষ্যত বার্তা বেঠিক না।

কিন্তু সৃজনের বেলায় মিলল না কেন?

সেবন্তীর এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, শুধুমাত্র সৃজনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। খিদিরপুরের একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে এখানে চলে আসার সিদ্ধান্তটাতো সম্পূর্ণ নিজের জেদ আর অহংকারের।

এখানে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন ছিল ওর। মা ছেলে সর্বক্ষণ পড়ার জগতে। যে যার নিজ বৃত্তে ব্যস্ত। দু দণ্ড গল্প করার সময় ছিল না।

এ সময়ের ছেলেরা বড় অভাগা।

খেলাধূলা করা গান শোনা টিভি দেখার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না। খবরের কাগজ জার্নাল ম্যাগাজিনেই বা কতটা সময় দিতে পারে। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন যন্ত্রের মতো শুধু পড়া আর পড়া। ক্যারিয়ার-কেন্দ্রিক পড়াশুনো।

এমন কি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না। আসলে তেমনভাবে বন্ধুত্বই গড়ে ওঠে না কারও সঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই অভিভাবকদের প্রভাবে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। দারুণ কমপিটিশন। কে কার চাইতে বেশি নম্বর পাবে। ভালো রেজাল্ট করবে।

আসল কমপিটিশন কিন্তু মায়েদের মধ্যে। দারুণ হিংসা অবিশ্বাস মিথ্যাচার মায়েদের মধ্যে। রেজাল্টের নম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে বলা অভ্যেস। কেউ কাউকে সাহায্য

সহযোগিতা করে না। অসুখ বিসুখে কারও ছেলে স্কুলে অনুপস্থিত কালে কি পড়ানো হয়েছিল জানতে চাইলে কিছুই সঠিক জানাবে না।

তো বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে কেমনভাবে।

সেবন্তী একদিন অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, হ্যারে সৃজু তোর কি কোনো বন্ধু নেই। আজ পর্যন্ত কাউকে আসতে দেখলাম না বাড়িতে। আমাদের সময় কত বন্ধু ছিল। ভাই বোন সবার। আমরা ওদের বাড়ি যেতাম খেতাম থাকতাম। ওরাও আমাদের বাড়িতে আসত খেত থাকত। নিজের বাড়ির ছেলে মেয়েদের মতো হয়ে যেত অনেকে। একেতেই নিজেরা অনেক ভাইবোন তারপর বাড়তি যোগে গম গম করত বাড়ি। মায়েদের মুখ খুশিতে ভরে থাকত।

থাকবে না কেন? জবাবে সৃজন বলেছিল, এখনকার ফ্রেন্ডশিপ ঠিক তোমাদের সময়ের মতো না।

সেবন্তী জানতে চাননি, এখনকার বন্ধুত্বটা কেমন। কারণ নিজের চোখেই তো চারদিকে দেখছেন। বন্ধু বন্ধুত্বর সংজ্ঞাটাই বদলে গেছে এখন। সহপাঠী সহকর্মী প্রতিবেশী ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ জীবন। বড়জোর হিতাকাঙ্ক্ষী বা ওয়েল উইশার। তাতেও আবার রং বদলায়। গিভ এ্যান্ড টেক পলিসির সংঘাত সংঘর্ষে।

সৃজনকে দোষ দিয়ে লাভ কি? ভালো কি দেখে বেড়ে উঠছে একালের ছেলেমেয়েরা। ওদের চোখের সামনে কোনো জীবন্ত আদর্শ পুরুষ নেই। আদর্শ পুরুষের জীবনী পড়ার সময় কোথায় এখন। ইদানিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব নিয়ে সেমিনার সম্মেলন হতে দেখা যায় মিডিয়া মাধ্যমে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। সবই অনর্থক মনে হয় সেবন্তীর। একান্নবর্তী পরিবার এখন নেই বললেই চলে। ছোট পরিবারেও শ্বশুর-শাশুড়িকে আজকাল বাড়তি বোঝার মতো মনে করে অনেকে। আর্থিক স্বচ্ছলতা যাদের নেই তারা তো বটেই ক্ষমতাবানেরাও একটিমাত্র সন্তানেই সীমাবদ্ধ থাকতে পছন্দ করছে।

কেন? সেবন্তী একদিন এক শিক্ষিকার কাছে জানতে চেয়েছিলেন। ওর স্বামী উত্তরাধিকারসূত্রে কলকাতায় বিশাল সম্পত্তির মালিক। নিজের বিখ্যাত গেঞ্জি কারখানা।

তাহলে দ্বিতীয় সন্তানে অসুবিধা কোথায়?

শিক্ষিকার জবাব ছিল, দ্বিতীয় সন্তান চাননা বাবা মা-র ভালোবাসা ভাগ হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

বিচিত্র যুক্তি। একাধিক সন্তানের মায়েরা শুনে কি বলবেন কে জানে।

সেবন্তী বেশ বুঝতে পারেন, সৃজনের নিঃসঙ্গ বড় হয়ে ওঠা ওর জীবনে বেশ প্রভাব ফেলেছে। ছোটবেলা থেকে একা বেড়ে ওঠা সন্তানেরা ভ্রাতৃত্ব কি তাই জানা

বোঝার সুযোগ পায়নি। লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ের সেমিনার সম্মেলন করেও ওদেরকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোঝানোর চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার আগে থেকেই কলকাতায় অল্প বেতনের একটা চাকরি করত সৃজন। পাশ করার পর দেশ বিদেশে চাকরির চেষ্টা শুরু।

একমনে পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন সেবন্তী।

স্যরি টু ডিসটার্ব ইউ। সৃজন একদিন এসে কাছে দাঁড়াল। সেবন্তী খাতা থেকে মুখ তুলে তাকাতে বলল, ভালো খবর বলেই জানাতে না এসে পারলাম না।

খবরটা যখন ভালো তো জানাতে দেরি করছিস কেন? সেবন্তী হাসলেন।

মাসকটের চাকরিটা আমার হয়ে গেছে। সৃজন প্রণাম করতে সেবন্তী অবাক হলেন। একালের ছেলে মেয়েরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না। করজোড়ে নমস্কার জানায়। নয়তো ঘাড় নামিয়ে হাত দুটো হাঁটু অব্দি নামায়। তার বেশি কিছু না।

ছেলে বিদেশে চাকরি করবে স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন সফল হলে নিজে যে ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন—সেটা সেবন্তীর মনে একবারও আসেনি।

মনে এসেছে খবরটা শোনার পর।

সী অফ করতে এয়ারপোর্ট গিয়েছিলেন সেবন্তী। খুব ভোরে উড়ান। তাই আগের দিন রাত্রে কাছাকাছি হোটেলে থাকতে হয়েছিল। সারারাত ঘুমোতে পারেননি। কতবড় গর্ব কথা ছেলে মাসকটে নামি কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার। তবু সেদিন কিন্তু এতটুকু আনন্দ হয়নি।

যথাস্থানে উপস্থিতি জানান দিয়ে মালপত্র ওজন করে হাতছাড়া হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহূর্তে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সৃজন।

সেবন্তী কান্না চেপে রেখে বললেন, যাওয়ার সময় এভাবে কাঁদতে নেই। অমঙ্গ ল হবে।

আমি তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব মা। সৃজন কান্না ভেজা গলায় জিগ্যেস করল, তুমি যাবে তো?

নিশ্চয়ই যাব। আগে তো তুই নিজে ঠিকঠাক ওখানে মানিয়ে নিতে শেখ। তুই নিজেও তো আসবি।

সে তো দু বছরে একবার। ওরাই যাতায়াত খরচ দেবে।

মাঝের বছরটায় না হয় নিজের খরচায় আসবি।

সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। তাছাড়া ছুটিই তো দেবে না।

সে দেখা যাবে। যাতো আগে।

সৃজন চলে গেল। জীবনে প্রথম আকাশে ওড়া। বিমানটা চোখের আড়ালে চলে যেতে সেবন্তীর বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় তোলপাড় করে উঠেছিল।

কে জানত, স্বপ্ন সফল এত বেদনাময়। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার। মনে হয়েছে, জন্ম ইস্তক শুধু ওর ক্যারিয়ার নিয়েই ভেবেছেন। বুক শূন্য হওয়ার আশঙ্কাটা একবারও মনে আসেনি।

জীবনে প্রথম আকাশ উড়ে বিদেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে সুন্দর একখানা চিঠি লিখেছিল সৃজন। সযত্নে রাখা সেই চিঠিখানা আজ হঠাৎই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে সেবন্তীর।

ইংরেজিতে লেখা চিঠিখানা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সৃজন লিখেছে, ইকনমি ক্লাসের টিকিট হলেও উড়ান সংস্থা কেন যে আমাকে এক্সিকিউটিভ ক্লাসে ভ্রমণ করতে দিয়েছে বুঝলাম না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে এরকম বিলাসবহুল ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া আনন্দের ব্যাপার।

আমার আসনটি জানলার ধারে। পাশের সীটে আগে থেকেই একজন সুন্দরী মহিলা বসেছিলেন। আজকাল সধবা বিধবা বোঝা সহজ না হলেও অনুমানে বিধবা মনে হলো। বয়স তোমার মতো হবে। পরে জেনেছি, ওর মেয়ের কাছে বেড়াত যাচ্ছেন। তোমার মতোই চুপচাপ পার্টি। আমার সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহ দেখালেন না। আমিও চুপচাপই থাকলাম।

ওমানিয়ান সুন্দরী বিমান সেবিকা যাত্রীদের বোঝালো, সীটবেল্ট কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত খুটিনাটি নানা সতর্কতা সম্পর্কেও সচেতন করল।

মাসকট হল সুলতান অব ওমানের রাজধানী। সেই সুবাদে বিমান সেবিকাকে ওমানিয়ান সুন্দরী বলছি।

বিমানের প্রত্যেকটি সীটের সামনে ছোট্ট একটি টিভি যাতে হিন্দি ইংরেজি দু রকম সিনেমাই দেখানো হচ্ছিল। হেড ফোনের মাধ্যমে ক্যাসেটের গান শোনার ব্যবস্থা ছিল।

উড়ান শুরু হওয়ার এক ঘন্টা পর বিমান সেবিকা চা কফি পরিবেশন করল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে আমি জানলা দিয়ে নিচের অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের নিসর্গ চিত্র দেখছিলাম। যেন স্বপ্নের স্বর্গের মতো। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

একসময় জানলাম, আমাদের বিমানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ছত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে উড়ে চলেছে।

শুধুমাত্র পেঁজা তুলোর মতো ভাসমান সাদা মেঘ ছাড়া নিচের অন্য কোনো দৃশ্যই আর চোখে পড়ছিল না। দুরন্ত গতিময় উড়ানে কোনো হেলদোল ছিল না। কোনো টেনশনও হচ্ছিল না।

বেলা বারটার সময় দুপুরের খাবার দেয়া হল। দামি খাবার। খাওয়া শেষ হতে আইসক্রিম ঠাণ্ডা গরম পানীয় যার যেমন পছন্দ।

এখানকার বিমান বন্দরের নাম শিব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। পাঁচ ঘন্টার

ভ্রমণ অন্তে বিমানটি যখন অবতরণ করছিল তখন সবুজ-নীল কার্পেটের মতো আরব সাগর দেখতে পেলাম।

ছোট ছোট টিলায় ঘেরা মাসকট আরব সাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পাশ্চাত্য ঢঙের সৌন্দর্যে সাজানো শহর। সাতাশ লক্ষ মানুষের বসবাস। ওমানের সুলতানই হল রাষ্ট্রের সর্বময় প্রধান কর্তা। বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয় আর বাংলাদেশিদের সংখ্যাই বেশি। তারপরেই লেবানীজ আর সুইডিসদের স্থান।

সাধারণ শ্রেণির ভারতীয়রা এখানে সংঘবদ্ধ ভাবে 'রুয়ি' (Ruwi)-তে বসবাস করে। আমাকে থাকতে দেয়া হয়েছে অবস্থাপন্নদের এলাকা 'অল কাওয়াইন' (Al Kwain) এলাকায়।

এখানকার মহিলারা পাশ্চাত্যের পোশাক পরলেও বোরখায় ঢাকা থাকে। মুখ-চোখের অংশটুকু শুধু বেআব্রু।

এখানকার জীবনযাত্রার ধরন-ধারন অনেকটাই পাশ্চাত্য-অনুসারি। বেশ ব্যয়বহুল। সড়কগুলি দারুণ প্রশস্ত। তিন সারিতে বিভক্ত। প্রথম সারি ষাট থেকে আশি কিমি গতির গাড়ির জন্য। দ্বিতীয় সারিতে আশি থেকে একশ এবং তৃতীয়তে একশ'র অধিক গতির গাড়ির জন্য। এখানকার সব গাড়ির চালকের সীট বাম দিকে। প্রতিটি গাড়িই আধুনিক প্রযুক্তিতে বিদেশে উৎপাদিত।

আরও অনেক বর্ণনা শেষে ইতি টানার পর সৃজন পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, দারুণ একটা খবর আছে। বিমানে আমার পাশের সীটে বসা মহিলাটি আমার ইয়ারের ছাত্রী রূপসার মা। রূপসাকে জাস্ট চিনতাম। যেহেতু দূরদেশে নিঃসঙ্গ দু'জনে একই কোম্পানীতে চাকরিতে এসেছি আশাকরি বন্ধুত্বও গড়ে উঠবে।

শুধু বন্ধুত্ব নয়, দু'বছৰ বাদে সামান্য ক'দিনের জন্য দু'জনে একত্রে এখানে এসেছিল। রেজিস্ট্রিমতে বিয়ে করে। তারপর ছোটখাটো গেট টুগেদার কাম রিসেপশন। উটিতে হনিমুন। সেখান থেকে ফিরে এসে সেই যে ফের আকাশ পথে মাসকট গেল আর ফিরল না।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সেবন্তী স্বয়ং নিজেকে বললেন, নাহ্-স্মৃতি আঁকড়ে কষ্ট পাওয়ার কোনোও অর্থ হয় না। স্মৃতি সতত বেদনাময়।

সৃজনের লেখা চিঠিখানা আর ওর পাঠানো ফটোর তৈরি এ্যালবাম যথাস্থানে রাখলেন। ভাবলেন, স্বপ্ন আর কর্ম ছাড়া কিসের জীবন। চাকরি ছাড়া অন্য বৃত্তির মানুষদের তো অবসর গ্রহণ বলে কিছু থাকে না। ওরা আমৃত্যু কাজ করে তাই নিঃস্ব শূন্যতা ওদেরকে গ্রাস করতে পারে না।

ভোজসভায় আমন্ত্রিত সবাইকে বোঝাতে হবে, মানুষ মানুষের জন্য। .... একটু সহানুভূতি কি পেতে পারে না?

ফোন বেজে উঠতে আগামী দিনের স্বপ্ন পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনা চিন্তায় বাধা পড়ল।

হ্যালো। সেবন্তী রিসিভার তুলে জিগ্যেস করলেন, আপনি কে বলছেন?

আমি আপনার পুত্রবধূ রূপসার মা বলছি।

আপনি। সেবন্তী অশুভ আশঙ্কায় চমকে উঠে বললেন, বউমা ওদের খবর কিছু—

ওরা ভালোই আছে। যতদূর শুনেছি, ওরা বোধহয় ওখানকার পাট চুকিয়ে ফেলছে। আমেরিকায় ভালো অফার পেয়েছে।

তাই বলুন। নিশ্চিন্ত হয়ে সেবন্তী বললেন, আপনিতো কোনোওদিন ফোন করেন না।

সেই খবরটার জন্যই আপনাকে ফোন করছি।

খবরটা কি?

তার আগে বলুনতো 'ইনটারন্যাশনাল লাভ এ্যান্ড লিভ', নামে কোনোও সংস্থার কাছ থেকে আপনার নামে কিছু কাগজপত্র গেছে?

হ্যাঁ পেয়েছি। রহস্যের আভাস পেয়ে সেবন্তী জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, আপনি জানলেন কেমন করে?

আমার নামেও এসেছে। এসব আমার মেয়ের কাজ। ইনফ্যাক্ট এতটাই রিঅ্যাক্ট করেছিল যে ওভার ফোন আমি ফোঁস করতে ছাড়িনি। রাইট এ্যান্ড লেফট যাচ্ছেতাই বলেছি। রূপসাই তখন বলল, সৃজনও তো ওর মা'র জন্য একই ব্যবস্থা করেছে। কই তিনিতো একটি কথাও বলেননি। আপনার সম্পর্কে আমার ধারণাটা যথেষ্ট শ্রদ্ধার। তাই কনফার্মড হতে ফোন করছি।

হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়া আমার মনেও হয়েছে। সেবন্তী ধীর স্থির শান্ত গলায় বললেন, বিনা মন্তব্যে কাগজপত্রগুলি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

ওয়াইজ ডিসিশান। আমিও তাই করব। মেয়ে জামাই কারও কাছ থেকে কিছুই আশা করি না আমি। সম্ভবত আপনিও।

আজকের দিনে কেউই বোধহয় তেমন কিছু আশা করে না। যেটা আশা করে সেটারই বিকল্প ব্যবস্থা করতে চেয়েছে ওরা। দ্রুততর বদলে যাওয়া জগতে এটা হল অত্যাধুনিক পরিষেবা। দশজনের সুবিধার্থেই তো এরকম সংস্থা তৈরি হয়েছে। অভূতপূর্বতো বটে। ওদের দোষ দিয়ে কি হবে।

ওরা ওদের মতো ভাবছে। আমাদেরকেও আমাদের মতের বিকল্প কিছু ভাবতে হবে। তাই না? আপনি শিক্ষার জগতের মানুষ। ভাবুন না কিছু।

ভাবছিতো। সেবন্তী আগামী দিনের স্বপ্ন পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসার শুনিয়ে বললেন, ওই দিনের ভোজসভায় আপনাকে আশা করতে পারিকি?

ইয়েস, লাঞ্চ ডিনার-এর শলাপরামর্শ সভাটা একদম লেটেস্ট। আমি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। চাঁদাটাদা কেমন দিতে হবে?

আপাতত কিছুই না। আসুন না ওইদিন। সম্পর্কে আপনি তো আমার বেয়াইন। আপনাকে আজ পর্যন্ত পেলাম কোথায়।

ওকে সি ইউ।

অপর দিকে লাইনটা বিচ্ছিন্ন হতে সেবন্তী রিসিভার রেখে স্বপ্ন পরিকল্পনা বিষয়ক ফাইলটা টেনে নিলেন।

ফোনটা আবার বেজে উঠল।

ওপার থেকে রূপসার মা বললেন, আপনার বাড়িটাই তো চিনি না। সেবন্তী পথনির্দেশ জানালেন। বললেন, সকাল সকাল চলে আসবেন কিন্তু।

হ্যাঁ, সকালে রোদ্দুর চড়ার আগেই আসবার চেষ্টা করব। বাই দি বাই আমি যদি আমার এক ভালো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাই, আপত্তি আছে? সেও মেম্বার হবে।

আপত্তি থাকবে কেন। যত সদস্য বাড়বে ততই তো ভালো।

ভদ্রলোক প্রচুর টাকার মালিক। বিপত্নীক। নিঃসন্তান। এরকম লোক মেম্বার হলে ভালো স্পনসার পাওয়া যাবে।

ওকে, আসুনতো আগে। সেবন্তী ব্যস্ততায় রিসিভার রাখলেন।

।। নয়।।

স্বামীর প্রয়োজনে নয়, নিজের দরকারে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে। তেমনি স্বামীও যে স্ত্রীকে ভালোবাসে তা আত্মার প্রীতি সাধনের জন্য।

পুত্রের প্রীতির জন্য পুত্ররা পিতার প্রিয় হয় না। পিতার প্রীতি সম্পাদনের জন্যই তারা পিতার প্রিয় হয়।

জীবজগতে প্রণয়ও নিজেদের স্বার্থে, পরের প্রয়োজনে নয়।

মানুষ যে দেবপূজা করে তাও নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য।

ভগবান একই সঙ্গে সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, বিরহ-মিলন, শোক-আনন্দ।, লাভ-ক্ষতি, জীবন-মরণ মিশিয়ে সৃষ্টির বীজ তৈরি করে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মানুষের ধর্ম কর্ম। সব কর্মের শেষ হলে তবে তো কর্ম শেষ হয়।

সহজ, মধুময় জীবন চলতে অসুবিধা কোথায়? মধু-ইতে অমৃত। তাকে লাভ করাই তো সাধনা।

হোক ক্ষণিকের। কিন্তু মধুর মুহূর্ত যে অনন্তকে পরাভূত করে। যার দ্বারা জীব সুখ অনুভব করে, সুখ কামনা করে, তার মধ্যেই আত্মা প্রচ্ছন্ন। সত্যকে কেউ আবৃত করতে পারে না।

ক্লীব হয়ো না। সব অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু ক্লৈব্যকে ক্ষমা করা যায় না।

সেদিন সেবন্তীর নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্পর্কে একখানা বই

এনেছিলেন অতীন্দ্র। এই লাইনগুলির নিচে কলমের কালির রেখা টানা থাকাতেই বইটা নিয়ে আসার অন্যতম কারণ।

অতীন্দ্র বইটির পাতা উল্টে পড়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছুই মগজে না ঢোকার নতুন করে আর পড়তে বসেননি। একখানা সাদা কাগজে কালির আঁচড় কাটা লাইনগুলি লিখে নিয়েছেন। যখনি মন চাইছে একবার পড়ছেন। পড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ আত্মস্থ থাকছেন। অদ্ভুত এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করছেন।

আজ সেবন্তীকে বইটা ফেরত দেবেন বলেই ফের একবার পাতা উল্টে দেখতে বসেছেন অতীন্দ্র।

'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।'

অতীন্দ্রর দৃষ্টি থমকে দাঁড়াল।

'ত্যক্তেন' হল গৈরিক বীজ। এই বীজ বৈরাগ্য আর অনাসক্তির। যে বীজ থাকে পুরুষের ভেতর। মুনিরা বলেন, 'ত্যক্তেন' অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা পরিশুদ্ধ হও।

'ভুঞ্জীথা' হল স্বর্ণ বীজ। এই বীজ দিব্য আসক্তি আর লক্ষ্মীর, যা থাকে নারীর ভেতর। ঋষিরা বলেন, 'ভুঞ্জীথা' অর্থাৎ ভোগ কর, দিব্য ভোগ।

নারী পুরুষের মিলনে সুন্দর সন্তানের জন্ম।

অতীন্দ্র মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস ওড়ালেন। তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। নিজেকে নিরুচ্চার প্রশ্ন করলেন, সুন্দর সন্তানেরা এখন কে কোথায়?

কাত্যায়নী স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলছেন, 'এই শিশির রৌদ্র জ্যোৎস্না তৃণ পুষ্প লতা—কেউ যেন একা থাকতে চায় না। জগতে যেন শব্দ বর্ণ ও সৌরভ শিহরিত করে জীবনের সঙ্গী অন্বেষণের এক অহরহ খেলা চলছে।'

অতীন্দ্র এখন ভাবছেন, এই একা হয়ে যাওয়ার সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে দ্রুত অতি দ্রুত। অনেকের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেও অনেকে দারুণভাবে একা। তাইতো সকাল বিকেলের আড্ডা-ক্ষেত্র সঙ্গীর অন্বেষণে সকলকে একত্রিত করে। সেবন্তী যে সেদিন সবাইকে চমকে দিয় আড্ডায় এসে বসেছিলেন তার নাভিমূলেও ছিল সঙ্গী অন্বেষণ। অন্যায় বা ভুলতো কিছু করেনি। অথচ একথা সত্য যে, সেদিন ওর আচরণে রাগ ক্ষোভ হয়েছিল।

অতীন্দ্র মোবাইল টেনে কাছে নিলেন। সেবন্তীকে এস এম এস করলেন, এ ক'দিন কারও বাড়ি থেকে কোনো ভেট আসছে না। কেন জানি না আজ আর রান্না করতে ইচ্ছে করছে না। আজ দুপুরে তোমার হাতের রান্না খেলে কেমন হয়? অসুবিধা থাকলে জানাও।

উত্তরে সেবন্তী জানালেন, কোনোও অসুবিধা নেই। নিজে থেকে আমার রান্না খেতে চাইছো, এতো আমার ভাগ্যের কথা। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে কি? ওরা আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকলে জানাও।

অতীন্দ্র জানালেন, তোমার স্বপ্ন পরিকল্পনা ওদের দারুণ পছন্দ হয়েছে। সবাই সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে উৎসাহী। নিঃসঙ্গ একজনতো সন্তানদের অমানুষিক আচরণে এতটাই তিতি-বিরক্ত যে বাড়িটা এরকম মহৎ কাজে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। ওরা সবাই তোমার নিমন্ত্রণ মতে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হবে।

অতীন্দ্র আশা না করলেও ফের সেবন্তীর এস এম এস এলো, খাবার রেডি থাকবে। তাড়াতাড়ি চলে এসো। সবাই রাজি থাকায় আমি খুউব খুশি। দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছি। নো মোর। সাক্ষাতে কথা হবে। এখন দেখি, তোমার জন্য কি রান্না করা যায়।

সেবন্তীর এস এম এস ডিলিট করতেই রিং টোন হল।

সতীন্দ্র কলিং।

অতীন্দ্র জিগ্যেস করলেন, কোথা থেকে ফোন করছিস?

বাড়ি থেকেই।

অফিস যাসনি আজ?

আজ আবার কিসের অফিস?

অতীন্দ্র বললেন, হ্যাঁতো আজ রবিবার। আসলে রিটায়ার করার পর তারিখ আর বার সবসময় মনে থাকে না। বল কি বলছিস।

তুই কি এখন বাড়িতেই আছিস?

হ্যাঁ। কেন?

আমি একবার আসতে চাইছি। জরুরি কথা আছে। বেশি সময় নেব না।

অতীন্দ্র কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, বেশি সময় নেব না মানে কি? এভাবে বলছিস কেন জানি না। আমার তো এখন অফুরন্ত সময়। চলে আয়।

একটু পরেই সতীন্দ্র এলো। রবিবার ছুটির দিনে সাধারণত ভালোমন্দ পাঁচ পদ রান্না হয়। নিশ্চিত ভেট আসে। অতীন্দ্র দেখলেন, সতীন্দ্রর হাতে কিছুই নেই।

সুমুখ দরজা খোলাই ছিল। অতীন্দ্র কফি তৈরি করতে ব্যস্ত ভেতর থেকে বললেন, সতু বোস। আসছি।

একটা ছোট ট্রেতে দু'মগ কফি আর একটা প্লেটে কিছু ক্যাপসিকাম পকৌড়া নিয়ে অতীন্দ্র সেন্টার টেবিলে রাখলেন। বসে বললেন, নে খা। চামচঅলা মগটা তোর।

তুই যে চিনি খাস না সে তো আমি জানি। সতীন্দ্র অহেতুক বলল।

অতীন্দ্র অনুমান করলেন, সতীন্দ্র এমন কিছু বলতে এসেছে যা শুরুটা কেমনভাবে করবে বুঝতে পারছে না। মনে মনে একটা রিহার্সাল চলছে। ওর অসহায় অস্বস্তি কাটাতে নিজে থেকেই বললেন, কি জরুরি কথা বলবি বলছিলি, বল।

আসলে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কিভাবে কথাটা বলব। সতীন্দ্র নিজের

দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়ে বলল, তাছাড়া শুনে তোর মনে কেমন রিঅ্যাক্ট করবে সেটাও ভাবাচ্ছে।

আচ্ছা আমাদের দুজনের সম্পর্কটা কি এতটাই ঠুনকো? অতীন্দ্র নির্ভেজাল আন্তরিকতায় বললেন, তুই নিশ্চিন্তে বলতে পারিস। অপ্রিয় সত্যি হলেও আমি কিচ্ছুটি মনে করব না। কথাটা যখন জরুরি তো বলতে দেরি না করাই ভালো।

সতীন্দ্র তবু নির্বাক। লজ্জা সঙ্কোচ ভয় মিশ্রিত চোখ চেয়ে তাকিয়ে রইল।

অনুমানে অতীন্দ্র বললেন, তুই সম্ভবত আমার সম্পর্কেই কিছু বলতে এসেছিস। ঠিক কিনা?

হ্যাঁ। ঠিক ধরেছিস। সতীন্দ্র ফের নির্বাকই রইল।

আসলে জানতে চাইছিস। সেদিন ঝড় বাদলের রাতে আমি কোথায় ছিলাম। অতীন্দ্র দ্বিধাহীন, নির্ভীক জানালেন, সেবন্তীকে তো চিনিস। ওর বাড়িতেই ছিলাম। এই প্রথম না। এর আগেও একদিন রাত কাটিয়েছিলাম।

আমাকে কিন্তু সেদিন ফোনে বলেছিলি, বন্ধুর বাড়িতে আছিস।

মিথ্যাতো বলিনি। এই বয়সে সেবন্তীকে বন্ধু ভাবতে দোষ কি?

আমি কিন্তু তোর কোনো দোষ ধরতে আসিনি। সতীন্দ্র বেআব্রু বলল, সেই ছোটবেলা থেকে সংসার সম্পর্কে বড্ড বেশি রকম ভাবতে গিয়ে আমি বেশ বয়স্ক হয়ে পড়েছি। সবার আপদে বিপদে সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে আমি ক্লান্ত। অনাহূত নাক গলিয়ে নাকটা ভোঁতা হয়ে গেছে। সতু-বিরুদ্ধ কথা শুনতে শুনতে এখন আর অনেক কিছুই কানে তুলতে চাই না। নিজের বৃত্তে একটু একা থাকতে চাই। আছিও তাই। তবু যে.... সেই আমাকেই সবাই—

সবাই তোর কান ভাঙানি করছে? কথা শেষ করতে না দিয়ে অতীন্দ্র রাগত বললেন, সেই সবাই কারা?

কান ভাঙানি কথাটায় আমার আপত্তি আছে। সতীন্দ্রর কণ্ঠস্বর প্রতিবাদীর মতো গম্ভীর হল। স্বল্প রুক্ষ মেজাজে বলল, সংসার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যারা কান ভাঙানি করতে ভালোবাসে তাদেরকে আমি ঘেন্না করি। চাটুকারের তোষামোদে খুশি আহ্লাদিত হওয়া মানুষদেরই কান ভাঙানি করা সহজ। সংসার তো বৃহৎ রাজনীতি-ক্ষেত্ররই ছোট সংস্করণ। আমাদের চারদিকে কোনো কোনোও আপনজনেরা যে ওই চাটুকার চরিত্রের তাতো একসময় তোকেও জানিয়েছি।

অস্বীকার করছি না। অতীন্দ্রর সরল স্বীকারোক্তি, তোর ওই সতর্কীকরণে আমার অনেক উপকার হয়েছে। মানুষ চেনার আশ্চর্যরকম নির্ভুল ক্ষমতা তোর। বিশ্বাস কর তুই আমাকে আজকাল এড়িয়ে চলিস বলে আমি ভীষণ একা অসহায় বোধ করি।

আজকাল কেন বলছিস। সতীন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল, বহুদিন আগে থেকেই

তো তোর সঙ্গে আমি আমার দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছিলাম। প্রথম টের পেয়ে তুই কারণটা জানতে চেয়েছিলি। কি কারণ বলেছিলামও মনে আছে?

বলেছিলি, তোর ছেলেমেয়েরা এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। একালের ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে যথেষ্ট যুক্তিবাদী বিজ্ঞ এবং উচিৎ বক্তা ভাবে। সম্মান অসম্মান শোভন অশোভনের তোয়াক্কা করে না। বয়স্কদের মুখের ওপর দুমদাম দশ কথা শুনিয়ে দেয়া খুব গর্বের ব্যাপার মনে করে। গুরুজন হিসেবে কাউকে মানতেই চায় না। তাই দূরে থেকে নিজের সম্মান বজায় রাখাই ভালো।

হ্যাঁ, ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলাম। সতীন্দ্র এবার আজ এখানে এভাবে আসার প্রসঙ্গে বলল, আমি যতই নিজের জগৎ নিয়ে নিস্পৃহ একা থাকতে চাই না কেন কপালের লিখন যাবে কোথায়! ফোনের পর ফোন আসছে। লন্ডন চেন্নাই থেকে পর্যন্ত। যে নীরুদা বাবা মা-র খবর পর্যন্ত নেয়া দরকার মনে করত না, কাল জামসেদপুর থেকে হঠাৎ তার ফোন। সবারই এক প্রশ্ন, খবরটা সত্যি কিনা?

কিসের খবর? অতীন্দ্র ভুরু কোঁচকালেন।

ওই যে অন্যত্র তোর রাত কাটানোর খবর। সেই সঙ্গে নানারকম মুখরোচক শোনা কথা। সবারই কম বেশি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সবচাইতে কাছের মানুষ এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও এমনটি হলো কেমন করে!

অনুভবও তোকে ফোন করেছিল? অতীন্দ্র অবাক হলেন, আমাকেই তো জিগ্যেস করতে পারত। কার কাছ থেকে শুনেছে বলেছে কিছু?

আমি জিগ্যেস করতে বলল, অংকিতার কাছ থেকে।

তার মানে অংকিতা ওর বাপের বাড়ি থেকে শুনেছে। অতীন্দ্র বিড়বিড় উচ্চারণ করলেন, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না, তাই মেয়েকে জানাতেই পারে। কিন্তু ওদের কানে কে তুলতে পারে?

আমার তো মনে হয়, কে কাকে কোন উদ্দেশ্যে কি বলছে—এসব নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। অতীন্দ্রর উত্তেজনা চিত্ত চাঞ্চল্য সামাল দিতে সতীন্দ্র বলল, দেখা দরকার নিজের মন কি বলছে। মন যদি বলে অন্যায় অনুচিত কিছু করা হয়নি, তো বাজে রটনায় পরোয়া কিসের।

আমি মনে করি না, অন্যায় অযৌক্তিক অপরাধ কিছু করেছি। অতীন্দ্র দ্বিধাহীন দৃঢ়তার সঙ্গে চড়া গলায় বললেন।

ব্যস্, মিটে গেল। সতীন্দ্র এবার নিজের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবিনয়ে বলল, তুই বলে দে এই যে নানাজনে ফোনে হাজার রকমের অস্বস্তিকর প্রশ্নে আমাকে নাজেহাল করছে তাদেরকে আমি কি জবাব দেব?

এতো বড় মজার কথা! অবাক অতীন্দ্র ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, জবাব দেয়াটা তোর নিজস্ব ব্যাপার।

আমি জাস্ট তোর কাছ থেকে সাজেশান চাইছি।

সাজেশান, আমার কাছ থেকে! অতীন্দ্র হাসলেন। চাপা অভিমান ঝরে পড়ল, তুইতো আর এখন আমার ফ্রেন্ড ফিলজফার লিগ্যাল এ্যাডভাইসার নেই। মুখপাত্রের দায়িত্বই বা নিতে যাবি কেন?

অধিক উত্তেজনা আর ভাবাবেগে সাময়িক চুপ করে থেকে ঝাঁঝালো গলায় ফের বললেন, সবাইকে সরাসরি আমাকেই ফোন করতে বলবি। সাহস থাকে তো যার যা খুশি আমাকেই জিগ্যেস করুক। কাছে পেলে যে মারটা হাতে মারতাম সেটা ফোনের জবাবেই মারব।

বৌদিকেও? উত্তেজনায় রাশ টানতে সতীন্দ্র একগাল হাসল।

ওকে টানছিস কেন? আমি বিলক্ষণ জানি, ও তোকে ফোন করেনি। ওর কান চিলে নিতে পারে না। তাছাড়া ভালোমন্দ দু'চার কথা শোনানোর থাকলে আমাকেই শোনানো ওর অভ্যেস।

কিন্তু চেন্নাই থেকে যে ফোন এসেছিল সেটা কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি। সতীন্দ্র জানতে চাইল, সেই ফোনটা তাহলে কার হতে পারে বলে মনে করছিস?

তোর সঙ্গে থেকে থেকে আমিও কিন্তু মানুষকে কম বেশি চিনতে বুঝতে শিখেছি। অতীন্দ্র খোস মেজাজের হাসি হাসলেন। বললেন, যাচাই করতে চাসতো শোন। ঈষিতা তোকে ফোন করেছিল। অ্যাম আই রং?

নট্ এ্যাট অল। অবাক সতীন্দ্র তারিফ করে বলল, ওর বিয়ের সময় থেকে আমি যে ওর দু চক্ষের বিষ সেটা তুই আমি দু'জনেই জানি। তবু সেই মেয়েই যে তোর ব্যাপারে আমাকে ফোন করেছে এটা ধরতে পারাটা খুব সহজ না।

আমার কাছে কঠিন কিছুও না। একজন জাঁদরেল সত্যসন্ধানী ব্যক্তির মতো ভাব ভঙ্গী করে অতীন্দ্র বললেন, ঈষিতাতো নিজেকে এখন আমাদের গার্জেন ভাবে। তোর বিকল্প ফ্রেন্ড ফিলজফার লিগ্যাল এ্যাডভাইসার হয়ে উঠতে চাইছে। আজকাল এরকম অনেক কিছুই আমি বুঝতে শিখেছি। আর এই চোখ খুলে যাওয়াতেই আমি অন্যমুখি বেঁচে থাকার ভাবনাচিন্তা শুরু করেছি।

অন্যমুখি মানে? সতীন্দ্রর কাছে রহস্যময় মনে হওয়ায় বলল, তুই ঠিক কি বলতে চাইছিস বলতো।

এখন না। অতীন্দ্রর ঠোঁটে দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল। বললেন, এখনোও জানানোর সময় হয়নি। সময় হলেই সব কিছু জানতে পারবি।

সতীন্দ্র আর কোনো প্রশ্ন জুড়ল না। জরুরি কাজে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বলল, এবার আমি উঠছিরে।

আর এক মিনিট বসে যা। আলতো করে হাত ছুঁয়ে অতীন্দ্র বাধা দিলেন। তারপর জরুরি কিছু একটা খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। সেই সঙ্গে আপন মনে বলে

চললেন, আমাকে বলে কিনা কি হবে ওই ধ্যেৎধেড়ে গোবিন্দপুরে থেকে। তুমি যে কবে আর কাকুদের চিনবে। তোমাকে না, তোমার টাকাকেই সবাই ভালোবাসে।

দাদা হয়তো আর ফিরবে না নিশ্চয়ই। তুমি বরং বাড়িটা বিক্রি করে দাও। তারপর চেন্নাইয়ে ফ্ল্যাট কিনে চলে এসো। আমাদের কাছে থাকবে।

অবশেষে অতীন্দ্র ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্পর্কিত বইখানা খুঁজে পেলেন। ভেতরেই ছিল সেই লেখা কাগজখানা। সতীন্দ্রর হাতে দিয়ে বললেন, তুইতো আর আমার মতো না। ঈশ্বর আর ধর্মটর্ম নিয়ে চর্চা করে থাকিস, তাই দিচ্ছি। পড়ে পরে আমাকে ফেরত দিস।

কি লেখা আছে না জেনে সতীন্দ্র ইতস্তত করে কাগজখানা নিল। ভাঁজ করে পকেটে রেখে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না।

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে অতীন্দ্র আঁতকে উঠলেন। কথায় কথায় কখন যে এত বেলা হয়ে গেছে টের পাননি। ভাবলেন, সেবন্তীর যে এখনও ফোন আসেনি সেটাই আশ্চর্যের। বেচারিকে ক্ষুধা পেটে অভুক্ত বসে থাকতে হবে।

অতীন্দ্র মোবাইলের সুইস অফ করে ঝটপট স্নান সারলেন। পোশাক পরে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করলেন। তারপর প্রধান দরজায় তালা দিয়ে মোবাইলের সুইস অন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এস এম এস আগমন বার্তার শব্দ হল।

সেবন্তী লিখেছেন, এত দেরি কেন? এখন কোথায়?

সড়কে পা দিয়ে তবেই অতীন্দ্র জবাবে জানালেন, অন দ্য ওয়ে।

কতদূর এসেছো? সেবন্তী জানতে চাইলেন।

এইতো এলাম বলে। অটোয় বসে অতীন্দ্র জানালেন।

আরাফ

মাচিসকল পানিকল হাড্ডিকল বাতিকল...

বাসস্টপগুলির এন্তার এরকম নাম এখন। এলাকাটা কেন্দ্রীয় কলকাতার কাছেই।

ভূতঘাট থেকে দরিয়া কিনারা বরাবর ছিল ফুল ফলের বাগিচা হি বাগিচা। আর ছিল সাহেবদের হাভেলি। ভিতর দিকে দেহাত ধাপা মানপুর আকড়া মুদিয়ালি। মনপসন্দ এই শুনশান্ তল্লাটে কালাপানিতে এলেন অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ। খাল কাটা মাটির পেল্লায় পেল্লায় উঁচু টিলা দেখে নাম রাখলেন, মেটিয়াব্রুজ। প্রধান পথের নাম কাচ্চি সড়ক।

ভায়া খিদিরপুর মেটিয়াব্রুজের বিচালিঘাট। নদীর ওপারে সাহেবদের হপ্তা শেষের খানাপিনা মজলিসস্থান। লোকমুখের নাম, কোম্পানীর বাগান। সেখানে যাতায়াতের এটাই ছিল সিধা সহজ সড়ক। তাই মেটিয়াব্রুজের সাহেবি আর এক নাম, গার্ডেনরীচ।

নবাবের আমলে ছিল লখ্নবী আদবকায়দা। মুসাভরি সোনারি সাদেকার কথকতা তানিয়াদারি। ছিল, মুর্গির লড়াই ঘড়ির নেশা আফিমখোর বটের বাজি। আর হাকেমি চিকিৎসা-ব্যবস্থা, আতরখানা। ফুল লতাপাতা বুটি কারুকাজের জন্য লখ্নবী পোশাকের ওস্তাদ ওস্তাগর আর ঘুড়ি তৈরির কারিগর আমদানী করেছিলেন নবাব। আমীর রইস আদমিরা চড়ত ফিটন গাড়ি। বিবিদের জন্য পালকি।

এসবই বাদশা আলীর শোনা কথা।

এখন বেপাত্তা বাগ বাগিচা মঞ্জিলের তল্লাট জুড়ে বিস্তর কলকারখানা।... সিমেন্টকল, সুতাকল, সাবুনকল, সিগারেটকল এরকম দেদার নাম। তবু, মহল্লার দলিজে দলিজে সেলাইকলের ঘর্ ঘর্ বাড়ছে বৈ কমছে না। মহেশতলা তালুকের কোঠা কুঠার খুপরি ইস্তক সেলাই কল হি সেলাইকল।

নসীব আলির পুকুরপাড়ে সবেদা গাছের নীচে বসে বাদশা বিড়ির ধোঁয়া ওড়ায়। দাদাজী দাউদ আলী ইংরেজ মেমেদের জন্য বাহারি গাউন বানানোর কেরদানি জানত। রইস আদমির বিবিদের তরফ থেকেও ডাক আসত। দাউদের কাছ থেকে পোক্ত তালিম নিয়েছিল বাপ দৌলত আলি। কিন্তু, দাউদ গোরে যেতে কারবারটা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি দৌলত। বারমুখো হয়ে পড়েছিল। খিদিরপুরের মুন্শিগঞ্জ থেকে বিষবিমার বাঁধিয়ে বসে। তাতেই বেসময় কফনে যেতে হয়।

ঘোলাটে চোখের কোণ থেকে জল গড়ায় বাদশার। বিড়ির ধোঁয়ায় খুক্খুক্

কাশে। ফজরের আঁধার পাতলা হয়ে আসে। আম, জাম, কাঁঠাল নারকেল সুপারি কলাগাছ ঘেরা কয়েক বিঘা বাস্তুজমির ওপর নসীব আলীর পাকা ছাদের মোকামটা এখনও অস্পষ্ট।

দাঁতে চেপে ফের একটা বিড়ি ধরায় বাদশা। আবার ধোঁয়া ওড়ায়।

চ্যাংড়ার পেটেও তো ভুগ লাগে। রজব মিস্ত্রির কাছে মোকাম রং-এর তালিম নিয়ে লায়েক পোক্ত হয়ে উঠল কচি বয়সের বাদশা। শাদী করে বহাল তবিয়তেই তো ছিল। কিন্তু রঙের কাজে বাঁশের ভারা থেকে নীচে পড়ে গেল একরোজ। জানে বাঁচল বটে, পিঠে কুঁজ নিয়ে তাকত খুইয়ে বসল। বুকে বারমাস কফ কাশি। হাঁপ ধরা শ্বাস কষ্ট।

বাঙালি বাজারের আকবর আলীর ঘুড়ির কারবারে দিনমজুরি বাঁশ চেরাই কাঠি গড়ার কাজ করে বাদশা। একে তো কারবারটা সাতমাসের। তাও ফি দিন কাজ জোটে না। বেকার সময় হেথা হোথা খিদমদ্গারি করে বেড়ায়। চুল্লু খায়, বিড়ি ফোঁকে। ট্যাকে টান পড়লেই বাদশা অবরে সবরে এভাবে নসীব আলীর ভিটেয় এসে ফকিরের মতো বসে থাকে।

নসীব আলীদের সাবেকি ওস্তাগরী কারবার। সেলাই ফোঁড়াই কারবারে দারুণ তারিফ নামডাক। সদর মহলের দেহলিতে তেরখানা সেলাইকল চলে। যেন ছোটখাটো কারখানা একটা। দলুজটাই অফিসঘর। হাওড়া হাটে তিনখানা ঘর নেয়া আছে। হালে মেটিয়াব্রুজের কারবালায় যে মার্কেট হয়েছে সেখানেও আশমানি সেলামি দিয়ে ঘর নিয়েছে একটা। কম সংস্থানের ওস্তাগরদের মতো হরিসাহা আর চেতলা হাটে মাল বেচতে যায় না নসীব।

সবেরে গোসল সেরে এসে সফেদ পোশাক পরে নসীব। নামাজ পড়ে নাস্তাপানিতে বসে। গাজর হালুয়া সেমোই লাচ্ছা পরটা—এলাহি নাস্তা ব্যবস্থা। কাজ কারবারে ব্যস্তবাগীশ হলেও খেতে বেশ সময় নেয় নসীব।

চার ভিটের ঘরগুলি থেকে দেদার ছানাপোনা বেরিয়ে আসছে। তিন বিবির তেইশজন ব্যাটাবেটি নসীবের। হালে পয়লা ব্যাটা আতরআলীরও শাদী হয়েছে। একুনে আঠাশজনের পেল্লায় পরিবার। তাতেও কী খামতি আছে? আতরের বিবি নামজার সঙ্গে নসীবের তিশরা বিবি হাসিনার আবারও হবে। সবার শেষে শয্যা ছেড়ে নসীবের কাছে এল হাসিনা।

খিড়কি দুয়ারে এতক্ষণে মনীশ মজুরদের ভিড় জমে উঠেছে। নসীব আলি ইমানদার আদমি। হুগলী নদীর ওপারে চাষআবাদের জমি জিরেত অনেক। মুরাই ভরা ধান পুকুরে মাছ আর গাঁই আছে কয়েকটা। হাঁস মুরগী তো আছেই। সাবেকি আমলে পর্দানসীন বিবিদের জন্য ছই দেয়া বয়েল গাড়ি থাকত। হালে মারুতি গাড়ি কিনেছে নসীব।

খুশবু মুখে মনীশ মজুরদের কাম কাজ বুঝিয়ে দেয় নসীব। তারপর পান জর্দা মশলার ডিব্বা হাতে দহলিজে খেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বাদশা না?

বাদশার পরণে মলিন জঙ্গলী ছাপ লুঙ্গি আর ছেঁড়া ফতুয়া। খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি। মাথায় শনের মতো চুলের জঙ্গল।

বাদশার দশা দেখে নসীব দরদি হয়ে ওঠে। ফাই ফুট ফরমায়েশ উশুল করানোর থাকলে করায়। নয়তো অন্দর মহলে দোসরা বিবি তাঞ্জিলার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে চিড়ামুড়ি চাল টাল পায়। বাড়তি খাবার থাকলে খায়। বরাত জোরে খ্যাটনও মারে।

বাদশা উঠে এসে কুর্নিশ করে সুমুখে দাঁড়ায়। ওকে দিয়ে আজ কোন খিদ্‌মদ্‌গারি করানোর নেই। অথচ, তাঞ্জিলার কাছেও পাঠায় না নসীব। দু'দিন আগেই গোচরে এসেছে, বাদশার প্রতি তাঞ্জিলার এত হামদরদি আশকারা নাকি ব্যাটাবেটি আর অন্য বিবিদের না পসন্দ। আগান বাগান অন্দরের কিছু খোয়া গেলেই সকলে তাঞ্জিলাকে রং তামাশা মশ্‌করা করে, নিশ্চয় তোমার পেয়ারের ভাইজান সট্‌কেছে। বাদশার হাতে একখানা বিশ টাকার নোট ধরিয়ে দেয় নসীব। বাদশার চোখ দু'টো ঝিলিক মেরে ওঠে।

বহুত মেহেরবান নসীব নবাব। বাদশা সেলাম ঠুকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

তাতো বুঝলাম মিঞা। নসীব সিধা ফর্সা সাবধানী শোনায়, কিন্তু এভাবে গোঁজা দিয়া কদ্দিন চালাবা। একটা কিছু উপায় দেখ।

সুরাহার আপনিই একটা বিধান দেন নবাব। মওকা মতে বাদশা বায়না ধরে।

যদি গলদ না ধরতো সলা দিতে পারি একটা।

আপনি আমার বাপজান। আল্লাহ খোদাও বটে। শরমসন্নত বাদশা বলে, গর্হিত কী আর কবেন?

তাহলে, কাল তোমার বেটিকে পাঠায়ে দাও। বাদশার ধরাস বুক ধপ করে জ্বলে ওঠে। কি বলতে চায় নসীব?

পানের পিচ ফেলে নসীবই মতলবটা ফর্সা করে দেয়, সেলাইকামে চুকুনে কাজ করবে। খোরাকি মুফতে। দর্জনে দেড়টাকা পাবে। হাত পোক্ত হলে মাসকাবারে কামাই কম হবে না।

মুখ কাচুমাচু কিছুক্ষণ মাথা নেতিয়ে থাকে বাদশা। তারপর দোনামনা সওয়াল রাখে, আকবর আলীর ঘুড়ির কারবারের গতিক সুবিধা না। আপনার সেলাইকলে বেশি কামাইয়ের কাজ কাম মিললে গায়ে গতরে ডাগর বেটির আসতে দরকার হয় না। দিনকালের গতিক যে ডর ধরায় নবাব।

তোমার বুকে দোষ। কলকারখানায় কাম করার গতর কোথায়! নসীব বিরক্তি প্রকাশ করে।

তা বটে। বিপাকে পড়ে সন্তাপি চোখে বাদশা কবুল করে, ফরমানটা মদিনার কাছে রাখব নবাব। তারপর হতাশ আক্ষেপ শোনায়, হক কথা কি জানেন? ভাত কাপড় দিতে না পারলে জরু আর খসমের কব্জায় থাকে না। খুঁতো মরদের সলা কি আর মদিনা শুনবে?

পাঁচ রোজ উতড়ে যায়। মদিনার কাছে সলাটা পেশ করতে কলিজায় তাকত পায় না বাদশা। এদিকে ট্যাঁকে গোঁজা বিশ টাকা বিলকুল সাফসুফ। আসামের গোলমালে চেরাই বাঁশ আসছে না। আকবরের ঘুড়ির কারবারে বেহাল অবস্থা। চুল্লু তাড়ি নাহয় বাদছাদ্ দেয়া গেল। কমসে কম নেশার বিড়ি মাচিসতো চাই। মদিনার জবাব না শুনে ফের নসীবের কাছেও যাওয়া যায় না। তাহলে কি শেষ অব্দি চুরি-চামারি ধরতে হবে।

গরিব হলেও বাদশা কিন্তু চোর ছ্যাঁচোড় না। ওয়ারিশসূত্রে যা ছিল গরিবিয়ানায় বেচে খেয়ে এখন দু'কুঠুরীর চালাঘরে এসে ঠেকেছে। খোলার চালের ফাটাফুটো দিয়ে বাদলা দিনে পানি ঝরে। বাঁশ কঞ্চি দরমার ঝাপ ঝরোকা। তাতে আবার ছেঁড়া চটের পর্দা। দেয়াল দেহলি মেঝে মাটির। হেথা হোথা ক্ষয়া ক্ষয়া। দেহলির খন্দে হাঁস মুরগী ছিল। হালে নেড়িকুত্তা থাকে। গাইগুলি বিকিয়ে গেছে কবেই। এখন পুঁজি বলতে ডোবার দু'টো ডাগর মাছ। বেনোজলে চারদিক ডুবে একসা হলে পড়শির পুকুর থেকে ফকিরদের এরকম খয়রাত দেন খোদা। বিপদ সময় একবার মাছ দুটো বিক্রি করার মতলব ধরেছিল বটে। সামাল দিয়ে আয়েসার শাদীর জন্য রেখেছে মদিনা। আবার সেই কু-মতলবটা বাদশার মগজে চাগাড় দিয়ে ওঠে। তক্কে তক্কে থাকে।

ফজরের রং ভালো ফর্সা না হতে হররোজ জঙ্গল ফিরে পুকুরঘাট ঘুরে আসে মদিনা। আয়েসা চা নাস্তার ইন্তিজাম করে। খালধারির নিজামুদ্দিনের বাস্তুভিটায় ঠিকা কাজকামে যায় মদিনা। সেখানে খড় কাটে জাবনা দেয়। গাই দুইয়ে বাড়তি দুধ বাস স্ট্যান্ডের চা মিঠাই দোকানে যোগান দিয়ে বেলায় ওয়াপস্ আসে। তারপর গোসল সেরে রসই ঘরে সেঁধোয়।

দুপোরে আয়েসা লখন্‌বী চিকণ কাজের তালিম নেয়ার মতলবে রবিউলের বেটি লায়লার কাছে যায়। বাদশাকে পাত্তা না দিয়ে মদিনাই ব্যবস্থা করেছে। হাত পোক্ত হলেই ভিটেয় বসে দুহাত ভরা কাজ পাবে আয়েসা। মাল হাত ফিরির দায় ওস্তাগরদের তরফে। সঙ্গে কাগজে আঁকা নকশা আর সলমা সুতো দেবে। এক পিসে বার আনা মজুরি। যত কাজ ততো কামাই। দম ফেলার ফুরসত্ পাবে না আয়েসা।

মাথায় হাত পড়ে বাদশার। নসীবের সুমুখে দাঁড়াবে কোন মুখে? রোয়াকের এককোণে একানে মনমরা বসে থাকে। ঝিমুনি আসে। অটোরিক্‌শার আওয়াজ শুনে ঝিমুনি টুটে যায়। বাদশা হতবাক।

অটো থামিয়ে এগিয়ে আসছে ষণ্ডা আদমিটা। ওই তো সুরত তাতে আবার কমতি দামের রঙিলা চশমা চড়িয়েছে। চেকনাই লুঙ্গির সঙ্গে ক্যাটমেটে লাল জালি গেঞ্জি পরা। গলায় রঙদার রুমাল জড়ানো টেরি কেটেছে জবরদস্ত। রুস্তমি গোঁফের আড়ালে সোনায় বাঁধানো দাঁত দু'টো বদখত্ ঝিলিক মারছে।

মুঠোর ফোঁকর দিয়ে ধোঁয়া টেনে সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে কেলে আদমিটা সিধা মদিনার ঘরে ঢোকে। মদিনা তৈরি হয়েই ছিল। বায়োস্কোপ দেখতে যাচ্ছে জানিয়ে অটোয় গিয়ে বসে। গা গতর চিড়বিড়িয়ে খুন টগবগিয়ে ওঠে বাদশার। কিন্তু পালোয়ান আদমিটার শয়তানি চোখ দু'টোয় নজর পড়াতে বেমালুম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে। তরাসে বুক ধুকপুকানি শুরু হয়ে যায়।

বিকালে ঘুম ভাঙতে মদিনার জন্য বাদশার মন্‌টা হু হু করে ওঠে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ভাবে, বিবিটা কী বেহাত্ হয়ে যাচ্ছে? রাজারহাটের বস্তির এই খালাতুতো ভাইটা কেন যে হালে হামেহাল আসছে! হামেশা থলেতে বাজার ধরে হাজির হয়। বেমক্কা মদিনাকে অটোয় চরিয়ে উধাও হয়ে যায়। আয়েসার জন্য মদিনার হাতে সওগাত পাঠায়।

দূরের কোন ডোবা থেকে জাগ দেয়া পাটপচা পানির বদবু ভেসে আসে। মশা ওড়ে ভন্ ভন্। বেখেয়ালে বাদশা ভাবে, মদিনা নিশ্চয় আজ খাতুন মহলে 'প্যার মহব্বত' বায়োস্কোপ দেখেছে। 'সিরাজ হোটেলে' মোরগা বিরিয়ানি মেরে তবে ফিরবে।

আয়েসা ফিরে আসে। যেন ওর ওপর নজর রেখেই ভটভটি হাঁকিয়ে আসে সিরাজুদ্দিনের ভাতিজা হায়দার।

হায়দার নিপাট ফিকিরবাজ। বেনিয়মে বাংলাদেশে যাতায়াত করে। টানা মালের চোরা করবার করে ধরা পড়েছে ক'বার। কয়েদখানা থেকে ছাড় পেয়ে ফের যে কে সেই। হায়দারের হাতে এক বোতল টানা বিলিতি শরাব দেখে বাদশা জুল জুল তাকায়। খোশমেজাজি হয়ে ওঠে।

নাম ধরে হাঁকডাক শুনে মতলবটা আন্দাজ করতে পারে আয়েসা। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দুমদুম পা ফেলে সুমুখে এসে দাঁড়ায়। বজ্জাত মৌজি ফূর্তিবাজ হায়দারের দিকে চোখের আগুন ছোটায়।

আয়েসার ওপর হায়দারের নেক নজর আছে। মিঠা হাসি চোখের ইশারায় কিছু সমঝাতে চায় হায়দার। সঙ্গে আনা কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিয়ে বলে, তোমার জন্যও আছে।

আগেভাগে একজোড়া অ্যালুমিনিয়মের গেলাস আর পানি ভরা বদনা রেখে যায় আয়েসা। তাতেই দু'কিস্তি গলায় ঢালে বাদশা। হায়দার পয়লা কিস্তির গেলাস ধরে বসে থাকে। বাদশার তিশরা কিস্তির মুখে ফের আয়েসা আসে। হাতে তোবড়ানো

পিরিচ। তাতে পেঁয়াজ লঙ্কা আদার কুচি। বাদাম আর শিক কাবাব। এসবই হায়দার এনেছে।

পিরিচটা সুমুখে রেখে বেজার আয়েসা। আর কোনও ফরমায়েশ আছে কিনা জানার জন্য উসখুস্ দাঁড়িয়ে থাকে।

মওকামতে হায়দার খোশামুদি হয়ে ওঠে, বেটি তোমার খুউব সুর্‌তি হয়েছে। শাদীর জন্য পরোয়া করতে হবে না।

বয়ান শুনে বাদশা খোয়াব দেখতে শুরু করে। শিক কাবাব দাঁতে কেটে জানতে চায় আচ্ছা কিস্মত দেনেঅলা জানপহচান আছে কেউ?

বাপর্জানের বেশরম বাত শুনে আয়েসা তিরিক্ষি মেজাজে পালায়। হায়দার মাতোয়ারা। ফিচেল হাসে। উস্‌কে দিতে নিজের চাইতে বাদশার গেলাসে বেশি ঢালে। পানি মেশায় কম।

হুকুম দিয়ে দেখ না ওস্তাদ। হায়দার তোয়াজ করে, এমন পাব্লিসিটি দেব যে বাস্তুতে উমেদারদের লাইন লেগে যাবে। বাছাই করতে হিমসিম খাবে।

—মশকরা করছ নাতো দোস্ত? খটকা লাগতে আধবোজা চোখ খুলে তাকায় বাদশা।

বিলকুল সাচ্ বলছি। বাদশার গালে টোকা মেরে হায়দার রঙ চড়ায়, বেটি তোমার সুলতানা হয়ে থাকবে।

বে আক্কেলে বোঁদার মতো কিস্তিতা একটানে মেরে দেয় বাদশা। নবাবী মেজাজে হায়দারের বিলিতি সিগারেট ধরায় একটা। ধোঁয়া ছুঁড়ে ফতোয় দেয়, আর তাহলে ঢিমা থাকা না। কালই ময়দানে নামো।

অত হড়বড় করা হক না। আদার কুচি জিভে টেনে হায়দার সমঝায়, গোঁজামিল শাদীর আখের ভালো হয় না। সবুর ধরতে হয়।

মজলিস মহরত জমে ওঠে। বেদম তোড়ে বোতল সাবাড় হয়ে যায়। ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে দুটি মাতালকে ডুবে থাকতে দেখে আয়েসা ফের একবার আসে। সুমুখে টিমটিমা কেরোসিন কুপি রেখে যায়।

আয়েসার শৌহর তালাশের ঠিকা নিয়ে হায়দার সওয়াল রাখে, তোমার বিবিকে তো টের পাচ্ছি না। বিবির সাপোর্ট পারমিশনও তো দরকার।

—সে কি আর ঘরে আছে। বুক চিতিয়ে বাদশা বলে, গার্জেন আমি। বিবির সঙ্গে কোন সলাপরামর্শের দরকার দেখি না।

—পরে যদি ঘোঁট পাকায়।

চিড়বিড় করে জ্বলে ওঠে বাদশা। এন্তার অগড় বগড় বাত্ শুরু করে। মদিনার নাম করে খিস্তির ফোয়ারা ছোটায়, সে মাগীতো আবাদি জিরাতি। বাদশা আলীর ফসল হল আয়েসা। পাঁয়তোড়া করলে পাছায় মারব তিন লাথি। পালাবার সড়ক পাবে না।

বাদশার বেসামাল গতিক দেখে হায়দার ফ্যাসাদে পড়ে যায়। সটকে পড়ার মতলব ধরে। কিন্তু, নাছোড় বাদশা। জাপ্টে ধরে হায়দারকে বসায়। মুসা মদিনার সম্পর্ক টেনে এনে নানা খেদ কথা শোনায়।। মদিনাকে টিট করার সলা শুনতে চায়।

বিপাকে পড়ে রগড় মশকরায় বাদশাকে নিরস্ত করতে চায় হায়দার। বাদশা টং হয়ে থাকা মেজাজে তড়পায়, মুসা কেমনতর ভাই সেটা ফর্সা হওয়া দরকার। মদিনা ফিরলে আজ এসপার ওসপার হবে। তেরি মেরি করলে তালাক অব্দি গড়াবে।

—আবাদি জিরাতি তোমার। হায়দার সলা দেয়, বেদখলের ডর থাকলে বেড়া লাগাও। সমঝাও, পেটাই কর। কোনও বেয়াড়া বেয়াদবি থাকবে না।

সলাটা বাদশার মনে ধরে। হায়দারকে হাতবেড়ি থেকে খালাস দেয়। একানে গুম মেরে বসে থাকে।

হায়দারের ভটভটির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে এমুখি অটোর আলো দেখা যায়। আওয়াজ শুনে আয়েসা রোয়াকে আসে। বাদশার সুমুখ থেকে লম্ফটা তুলে উচিয়ে ধরে।

মদিনাকে নামিয়ে দিয়ে মুসা এক লহমায় উধাও হয়ে যায়।

বাদশার নেশা—ঢুলুনি জখম হয়। বাদশা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। টানা মাল পেটে নিজেকে নবাবের মতো হিম্মতওলা ঠাওরায়। হোক না মদিনা জিদ্দিবাজ খাণ্ডাল। আজ আর কোনোমতেই হেলাফেলা হেনস্তা করে পার পাবে না।

মদিনা সুমুখে এসে দাঁড়ায়। লম্ফ রেখে ঘরে সেঁধোয় আয়েসা। মদিনা হাঁটু ভেঙে বাদশার মুখোমুখি বসে। মাঝে কেরোসিনের রোগা আলো।

ব্যাস্, বাদশার বেখাপ্পা মেজাজে যেন ঠাণ্ডা পানি তঢালা পড়ে। রাগে টং হয়ে থাকা সব হিম্মত কেরামতি তড়পানি ভড়কে যায়।

জব্বর নজরদারি সেজেছে বিবিজান। খুউব সুর্‌তি লাগছে। পরণে ডোরা কাটা জলুমদার শাড়ি। হাতে গুচ্ছের রঙ্ বেরঙের কাঁচের চুড়ি। সুরমা টানা চোখ। পান চিবানো রাঙা ঠোঁট। বাতাসে ভাসছে আতরের খুশবু। বেরুনোর বেলায় তো এত নজর কাড়েনি!

খোসমেজাজি মদিনা বেসরম গা ঘেঁসে বসে। রঙ ঢঙ হাসি উড়িয়ে বিস্তর মিছা কথা শোনায়। ফিচেল ফাজলামো করে। সরাবের বদ্‌বুতে খেঁকিয়ে চোটপাট বেইজ্জত করা যার আদত সে কিনা এখন ফাগুন ফজরের দোখ্‌না বাতাসের মতো!

—নেশা করছনি মিঞা? মদিনা মশগুল, তোফা খোশবাই পাইছি।

—বিলিতি যে। কলিজায় তাকত পেয়ে ছলচাল বুজরুকির ধার ঘেষে না বাদশা। সাধাসিধা জবাব দেয়, হায়দার আনছিল।

সরাব খাওয়ার বৃত্তান্ত শোনায় বাদশা। হায়দারের ফেলে যাওয়া প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরায়। মদিনার মুখে ধোঁয়া ছোঁড়ে। মদিনা গোস্‌সা করে না।

কোহরা উবে যায়। হরেক গল্পগাছায় মিঞা বিবি আয়েসার শাদী সম্পর্কে সহমতে আসে। বাদশার দাপানি গজরানি আফসানি ছরকট্ হয়ে যায়। হায়দারের সলা বেমালুম ভুলে আবাদি জিরাতির দিকে হাত বাড়ায়।

মরদের মাফ মকুবই বিবিকে কব্জায় রাখার যথার্থ বেড়ি না। নয়তো, তিন রোজ পর মদিনা ফেরার হয়ে যাবে কেন?

রোজকার মতো ফ'জরে নিজামুদ্দিনের বাস্তুতে ঠিকা কাজকামে গেছে মদিনা। আকবরের ঘুড়ির কারখানায় বাদশা ঢু মেরে এসেছে। বহুত বেলা ইস্তক বাপবেটিতে বিলকুল আঁচ করতে পারেনি। ধা ধা রোদের দুপোরে তালাশে গিয়ে নিজামুদ্দিনের মোকামে মদিনার গরহাজির টের পাওয়া যায়। বুরবাক বনে যায় বাদশা।

ফিরতি পথে ইসমাইল ওস্তাগারের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে মোলাকাত। বাতচিত্‌কালে বাদশার খটকাটা ইসমাইল ফর্সা করে দেয়। ফজরে মঙ্গলা হাট থেকে সে ওয়াপস্ আসছিল। মুসা মদিনাকে বিচালিঘাটের খেয়া পার হতে দেখেছে।

দেহাতের হালচাল আদত আজব বটে। মদিনা গায়েব হওয়ার বদনাম বৃত্তান্ত ঢিঢিক্কার হতে সময় লাগে না। অগ্রে যারা বাদশার ভিটেয় আসেনি তাদেরও যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। আলটপকা মোলাকাত্ কালে
খটমটা এন্তার সওয়ালের জবাব দিতে গিয়ে বাদশা

যে যত অকথা কুকথায় রগড় মশকরা করুক না কেন মদিনার কোন গলদ ধরছে না বাদশা। গতর খোয়ানোর পর থেকেই ছিল জরুকা গোলাম। হালে মদিনা নাম মাত্র বিবি ছিল। ফন্দি ফিকির না-জানা বেরোজগেরে আদমির বিবি ভাগবে, এ আর তাজ্জব কী! তবু আপদ গেছে ভাবতে পারে না কাহিল বাদশা।

দু'রোজ পর আঁধার পিঁড়ায় চোখ বুজে বাদশা সাত সতেরো বদ নসিবি নিয়ে ভাবছে, হায়দার হাজির। কাঁধে হাত রাখতেই আশমান থেকে যেন ঝুম ঝুম পানি ঝরে পড়ে।

পতপতানি গতরে হাউমাউ কেঁদে বাদশা খেদ জানায়, আমি নাহয় ফালতু। পেটে ধরা দরকচা বেটিটার জন্য একটুকুন ভাবলনি। কেমনতর মাগী?

আয়েসা কোথায়? সওয়াল শুনে হায়দার পাশ কাটায়।

সে বেটি আজ্‌তক একবারটি খুপরির বাইরের আসলনি। বাদশা নিজের নাকাল অক্ষমতা গোপন রাখে না, দশজনে কইছে ম্যাদামারা মাদীদের বিবিতো ভাগবেই। তা এ্যাখুন বেটির সুমুখে দাঁড়াব কেমনে?

হিম্মত ধর মিঞা। কাঁধে পোক্ত চাপ দিয়ে হায়দার বিপদকালের হিতকারী হতে চায়, তাহলে বাপবেটি দু'রোজ ভুখা আছ?

হাঁটুতে থুতমি গুঁজে অবোল বাদশা।

কেরোসিনের কুপি হাতে আয়েসা আসে। দু'জনার সুমুখে রাখে। হায়দার তক্কে তক্কে ছিল। আজ আর বোতল টোতল আনেনি। ঝোলা থেকে খাবার মোড়কের টোপটা আয়েসাকে ধরিয়ে দেয়, বাপবেটিতে খেয়ে নাও। বেটিরা হল আব্বাদের আম্মাজান। বাদশার ওপর নজর রাখা এখন তোমার কাম।

—এ তো ঝঞ্ঝাট হল হায়দার। খোলা মনে বাদশা বলে, আজ নাহয় তুমি খাওয়ালা, কাল? দু'টা পেট চলার ভরসা কী। বেটিটাকে সামাল দেবে কে?

—কাল আল্লাহ্ আছেন। মুশকিল আসান হিসাবে একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট হাতে গুঁজে দিয়ে হায়দার বলে, রাত্তিরে টানা মাল আসবে। সেগুলো কিলিয়ার করতে কাল রাত কাবার হবে। পরশু ফের আসব। একটা কিছু সুরহা হবেই। এলাহি ভরসা।

জবান-মতে মদত করতে হায়দার আসে ঠিকই, তবে মগজে কারবারি মতলব ধরে। এন্তার নবাবী খানার সঙ্গে বোতলও এসেছে। আয়েসার জন্য রঙ্দার সালোয়ার কামিজ সুর্মা কাঁচের চুড়ি। সেন্ট শ্যাম্পু সাবান—সব বিলিতি।

দিনের শেষে খানাপিনা নেশায় মেজাজ শরিফ বাদশা মশগুল। মওকা মতে হায়দার দরাজ দিল দেখায়। একশ টাকার খান কতক নোট ধরিয়ে বলে, পাঁচশ আছে। আয়েসার সঙ্গে শাদীর দাদন হিসাবে রাখ। শাদীর দিন আরও পাঁচশ পাবা। তারপর ওয়াদা করে, শাদীর পর ফি মাসে তোমার জন্য একশ বরাদ্দ। খোদা-কসম।

বরকত আর কাকে বলে? বাদশার চোখ কপালে ওঠে। এ যেন পানি না— মাঙ্তে আশমান থেকে দুধ ঝরে।

বাদশা মনের ভাবগতিক টের পেতে দেয় না। ঝুটা না- খুশ ভাব দেখায়। টাকা হাতে ধরে হায়দারের দিকে মিয়ানো চোখে তাকিয়ে থাকে।

—তুমি গররাজি বাদশা? ভড়কে গিয়ে হায়দার সওয়াল রাখে, আমি তোমার মনপসন্দ্ না? নিজের কেরামতির ফিরিস্তি দেয়, ফ্যান্সি মার্কেট টুকরা পট্টি আর বড়বাজারে একুনে তিনখান দোকান আমার। আকড়া রোডের অতবড় মোকামটি একা আমার নামে। কি নেই সেখানে? বিলকুল বিলিতি দিয়ে সাজানো। তোমার বেটি সুলতানির মত থাকবে।

—সে কি জানি না? মাথায় শনের জঙ্গলে বাদশার হাতের আঙুল সেঁধোয়।

—তবে কি?

—তুমি আমীর আদমি। দোমনা কাটিয়ে বাদশা সাফ সাফ বলে, গতর খোয়ানো গরিব বাপের ওই একখানাই মা। তো কিম্মতটা ল্যাহ্য বলছ না।

—শাদীর বেবাক খরচাতো আমার। ফকিরের বেটি সুলতানা হবে। হিসাবে এগুলাও তো ধরতে হবে।

—হিসাব ধরেই কইছি। মেটেব্রুজের ওস্তাগার মহল্লায় ব্যাটাবেটিদের বাজার দরতো জান। রেডিমেড পোশাক তৈরির কারবারে কত হাত লাগে। কাটার কলঅলা চুকুনেঅলা প্যাকার আরও কত কি! ঘুড়ি তৈরির কারবারেও অমনি চাহিদা। বছর দশ বার ওমর হলেই কিছু একটা কাজকামে লাগায়ে দেখা যায়। আমার যদি দশখান থাকত তোমার কোনো টাকাই নেয়ার লাগত না।

বাদশা লম্বা শ্বাস ওড়ায়। তকলিফটা হায়দারকে দরদি করে তোলে, কত চাও তুমি?

—যা বলছ তার ডবল।

—মাসেরটাও?

—সেটাতো আরও জরুরি। বিবি বেটি কেউ থাকবে না। তো গতর খাটায়ে খাওয়াবে কে? আয়েসা হাতছাড়া হওয়ার ডরে হায়দার আর দরকষাকষিতে যায় না। বাদশার বিলকুল দাবি মেনে নেয়।

আয়েশার কদর বেড়ে যায়। ফজরে দিলখুশ জাপ্টে ধরে বাদশা। চুলে হাত বুলায়, কপালে মরমি চুমা খায়। মন পসন্দ খাবারের নাম ধরতে বলে। রিকশায় চড়ে বেহিসাবি বাছাই বাজার ধরে আনে। সরাবের বোতলও বাদ যায় না। নজরকাড়া দেমাকি হালচাল বটে।

এত ঠাটবাট বড়াই যে হায়দারের টাকায় আয়েসা তা আন্দাজ করতে পারে। তবে কোন মতলবে টাকা নেওয়া আর বিবি খুইয়েও খোশমেজাজ তা আঁচ করতে পারে না। খটকাটা মনে ধরে তরাস তক্কে তক্কে থাকে।

নেশায় বুঁদ বাদশাকে একরোজ মওকামতে আয়েসা সওয়াল ধরে, আলটপকা এত নবাবীয়ানায় ট্যাকা এল কোত্থুনে?

—হায়দার দেছে।

—কেন?

—পাওনা ছিল। এখনও অনেক বকেয়া আছে।

—তুমি যে পাওনাদার, এ্যাদ্দিন তো শুনি নাই। আম্মাজান জানত?

—ত্যাখন পাওনাই ছিল না।

—এই ক'দিনে কিসে পাওনা হল?

—তুই দিছিস। আল্লাহর খয়রাত রোশনি তুই।

নেশায় বেসামাল বাদশা শাদীর বৃত্তান্ত বেফাঁস শুনিয়ে ফেলে। এতটুকু বাদছাদ যায় না।

—বাপ না কশাই? বেশরম বয়ান শুনে আয়েসা ফ্যাঁকড়া তোলে, এই বেইজ্জতি শাদী আমি করব না আব্বাজান।

—আলবত্ করবি। নিমকহারাম বদনামি নিতে পারব না।

কীসের বদনামির ভড়কানি? বাদশাকে ফরিয়াদি করে আয়েসা গলা চড়িয়ে ফইজত করে, বেটি বিককিরির ট্যাকায় ফুর্তিবাজি করতে শরম হয় না?

—বিক্রি কোথায়? নেশায় নিলাজ বাদশা খতরা দেখতে পায়। সন্তাপি চোখ মেলে গলার ঝাঁজ নরম করে, খারিজ করিস না বেটি। ফকিরের চালায় পয়দা হয়ে হায়দারের মত শোহর মেলা কিসমতের ব্যাপার। ধুমধাম শাদী হবে। হায়দার তোকে খানদানি আয়াশ আরামে সুলতানা করে রাখবে।

বাদশা হাজার লালস দেখায়। আয়েসার বাগড়া তবু বাগ মানতে নারাজ। হররোজ বাপেবেটিতে চলে কচকচানি কাজিয়া বিবাদ। শেষ অব্দি দু'জনেই জিদ ধরে থাকে। বাত্‌চিত্ বন্ধ।

দশরোজ পর হায়দার হাজির। সেও ব্যাটা নাছোড়বান্দা। মেয়াদ বাড়ায় আর ক'রোজ ফাঁকে ফাঁকে আসতে থাকে। ফিবার কারবারি তাগাদা মারে, আয়েসার দখল বা দাদনের টাকা ওয়াপস্-চাই-ই-চাই।

বাদশারও সাফ জবাব, বকেয়া টাকার আঞ্জাম কর। আয়েসার উশুল নিয়া রেহাই দাও। বায়নার টাকা ফিরতযোগ্য না।

বাদশার নাকাল দশা দেখে নাচার আয়েসা একটু একটু নরম হতে থাকে।

একরোজ আয়েসা চাতালের পোরে ভুঁইয়ে শোয়া দরমার বেড়াঘেরা খড় চালের কুঠুরির দিকে তাকায়। গরিবিতে বিকানো বাকারাহ গুলাকে মনে পড়ে। অকেজো ঢেঁকিটার দিকে নজর ফেরায়। বিজলি মেশিন বসায় কেউ আর ধান ভানতে দেয় না। চাষ আবাদের ধান জমিই বা থাকছে কোথায়? জমি জিরেত জুড়ে জেল্লাদার পাকা ছাদের মোকাম মহল্লা বাড়ছে। আশমান ছোঁয়া দরদামে জমি বিক্রি হচ্ছে। সেই টাকায় ওস্তাগরদের কারবারে রমরমা এখন। দিনমজুর গরিবদের হালতে কোন হেরফের হচ্ছে না।

হাঁটুতে থুতনি গুঁজে চোখ ছল ছল আয়েসা গুমরায়, আম্মাজান ফেরার। আব্বাজান বেদরদি। হলেও বা খুব সুরতি, পরনে ছেঁড়াতাপ্পি কাপড় আর ক'গাছা কাঁচের চুড়ি। নোকরানির মতো যা খাটুনি, বাহার থাকবে কদ্দিন? এরপর প্যাংলা হতে হবে। মেচেতা দাদ হাজা বিখায়ুজ উকুন ধরবে। কত কী যে বেহাল দশা হবে। আগাম আন্দাজ করে ডর লাগে।

আখেরে বেদরদি বাদশার ওপর ধিক্কারে আয়েসা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। শাদীর জন্য সবুর ধরে না। একরোজ বাদশার ওপর হায়দারের চোটপাট হুজ্জুতি-সময় সিধা হায়দারের ভটভটির পিছনে গিয়ে বসে। বরাবরের জন্য বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে যায়।

বাদশার এতটুকু সন্তাপ হয় না। বরং হায়দারকে রসুল মনে করে। দিল খুশ বগল বাজায়। আশমানের দিকে হাত তুলে বিস্‌মিল্লাহকে সন্নত সালাম জানায়।

বাদশা এখন ঝাড়া হাত পা। গাল সাফসুফ। কেতাদস্তুর চেকনাই পোশাক পরে। আমিরি চালে চরে বরে। আলুফা পাওয়া টাকা ফতুর হলেও কুছ পরোয়া নেই। ওয়াদামতে মাস কাবারে হায়দারের বরাদ্দ টাকা আসে। বাঁশ নারকেল মাছ হরকিসম বিক্রিবাট্টাতো আছেই। চালাঘরটা হয়ে দাঁড়িয়েছে লোচ্চাদের গাঁজা হেরোইন সরাব সাট্টার ঠেক। তাতেও কিছু রেস্ত আমদানি হয়।

বছর উত্‌রে যায় আয়েসা এমুখো হয় না। বাদশাও যায় না। হায়দারের সঙ্গে মোলাকাত কালে আয়েসা বহাল তবিয়তে আছে খবর মেলে।

আল্লাহ্‌তো কমজোর করেই হাজির করেন। তাকত দেন পরে। সাট্টা ঠেকের রহমতের সঙ্গে বাদশা জোট বেঁধে মতলবি হয়ে ওঠে। রেশন কার্ডের দালালি ধরে। সেখানে যাতায়াতে মগজটা ফর্সা হতে শুরু করে। খুতো-খাতিরে ব্যাঙ্কের কর্জ টাকায় অটোরিক্সা খরিদ করে। ইজারার টাকায় কিস্তি শোধ হয়। তারপরও মাস কাবারে মোটা টাকা হাতে থাকে। প্যাংলা থেকে চাঙ্গা চনমনে হোঁদল হয়ে ওঠে বাদশা। কলকারখানার মেটিয়াব্রুজের বাতাসে যে টাকা উড়ছে তা ঠাহর করতে পারে। তাই মগজে ধান্দা হি ধান্দা। তাতেই নসীব আলীর কলে পড়ে যায়।

পদীর হাটি রামদাসহাটি পাঁচুড় জুড়ে পাইকারি বিক্রিবাট্টায় বাজার বসেছে খানকতক। কলকাতার হাট ছেড়ে পাইকর গাহেক ফোঁড়েরা হালে এদিকেই ভিড় বাড়াচ্ছে। আমীর ওস্তাগররা অনেকে তাই বাজার গড়ার খোয়াব দেখছে। নসীব আলীও একজন। বাদশার জমির পাশে কিছুটা জমি খরিদ করেছে নসীব। বাদশার জমি থেকে দু'কাঠা পেলে মহরম মার্কেটে'র চাইতে নজরদারি 'নসীব মার্কেট' গড়া যায়।

নসীবের তরফে ডাক আসে। হালগতিক বুঝে বাদশা বেখাপ্পা দর হাঁকিয়ে বসে। গা জোয়ারি নাকি! তাজ্জব নসীব বদমেজাজে দাবড়ি দিয়ে ওঠে।

—গা জোয়ারি কোথায় দেখলেন নবাব? বাদশা ঠাণ্ডা দেমাকে সওয়াল রাখে।

—নয়তো কি? নসীব চোখ কটমট চোটপাট করে, খাপছাড়া দর চাইছ।

জমি আমার। বাদশা সাফ্ শোনায়, আপনি কামাইয়ের ধান্দায় নেবেন। আমি গরিব বলে কি ধান্দা কামাই থাকতে নাই?

—নিশ্চয়। হেলাফেলা বেইজ্জতি হলেও নসীব সমঝোতায় আসতে চায়। গরিবি কালে মদত খেয়াল করিয়ে সওয়াল রাখে, সেই বিধায় তো কিছু খাতির করবা?

—হালে মেটব্রুজের জমির আগুন দরতো দেখছেন। আরও বাড়বে। কারবারি আপনি নিশ্চয় মানবেন যে, ধান্দা কামাইয়ে কোন খাতির থাকতে নাই।

—তুমি বেইমান। এককালের হাবাগবা মিনমিনার মুখে বেমক্কা চোস্ত জবাব শুনে নসীব রোখা মেজাজে নজির দেখায়, ইয়াদ নাই তোমার! অটো রিকশা খরিদ

করার কর্জর জন্য খত্ লিখছিল কেন মিঞা? ব্যাঙ্কে জামিনদার ইস্তক এই নসীব আলী। কোন ধান্দা ছিল আমার?

ইশারাটা ধরতে পেরে বাদশা ঘায়েল হয়। ভ্যাবাচ্যাকা মুখে রা কাড়ে না। খতিয়ে দেখে, নসীব আলীর সঙ্গে বিবাদে যাওয়া আহাম্মকি হবে। নরম হয়ে সওয়াল রাখে, কি দর কইছেন আপনি?

তিরিশ হাজার কমে রফায় আসো। হুকুমের ঢঙে নসীব জবাব দেয়।

বাদশা বিপাকে পড়ে যায়। গরিবকে বেকায়দায় ফেলে ঠকাতে চাইছে নসীব। সুমুখে বসে না রাজি হওয়া মুশকিল। মানতে গেলে অনেক টাকা লোকসানি। ফেরেবি বুজরুকির ধার ধারে না বাদশা। ভিটে ছেড়ে ভাগবার ফন্দিফিকিরও মগজে আসে না। তাই মর্জি সাব্যস্ত করতে ক'রোজ সময় চেয়ে নেয়।

দিমাক আনচান, অটো রিকশায় চড়ে বসে বাদশা। কিছুদূর গিয়ে কলকারখানা ছুটি আর বায়োস্কোপ ভাঙার ভিড়ে জ্যামজটের কবলে পড়ে যায়। জাহাজ কলের সুমুখে থানার ধারে ভাটিখানায় সেঁধিয়ে বসে। এক পাঁট গলায় ঢেলে বুদ হয়। ফের বেখেয়ালে আকড়া সড়ক ধরে।

হায়দার কমল টকিজ থেকে গরম খেলা দেখে ফিরছিল। আনসারি মার্কেটের সুমুখে মোলাকত। খাতির পাকড়াও করে হাবিবুর হোটেলে নিয়ে বসায়। খোশমেজাজি অর্ডার হাঁকায়, দো চিকিন চাপ দো মটোন রেজেলা ছে পরটা দো স্যালাদ্।

আয়েসার জন্য বাদশার ভিতরটা টনটন করে ওঠে। মদিনার মত জিদ্দি হয়েছে বেটি। আজ ইস্তক হায়দারও একরোজ ওর মোকামে ডাকেনি। তো সে কোন আক্কেলে যাবে?

—কেমন আছে আয়েসা বেটি? বাদশা সওয়াল রাখে।

—দিলখুশ। বহুত আচ্ছা। হায়দার ঝটপট জবাব দেয়।

—অনেক ডাগর হয়েছে? দেখতে?

—চাঁদনি চটকদার।

—ছানাপোনার খবর শোনাবা কবে?

—সবুর ধর। সময়কালে ঠিক খবর পাবা।

টেবিলে খাবার আসে। গোছগাছ করে দিয়ে যায়।

এতক্ষণ হায়দার হেলাফেলা গোঁজামিল জবাব দিচ্ছিল। খেতে খেতে সওয়াল রাখে, হংকং ঘুরতে যাবা?

নেপাল বোম্বাই বাংলাদেশের মতো হংকং নামটাও মেটিয়াব্রুজের মহল্লায় মহল্লায় কাচ্চা বাচ্চারা জানে। কারবারিরা হামেহাল সেখানে যাতায়াত করে। নাজবাব জলুসদার বিলিতি চিজ নিয়ে আসে। হংকং যে ইন্ডিয়ার বাইরে দূরের দেশ বাদশা তা জানে। তাই মিন মিন জবাব দেয়, সে তো ফরন্। পাশপোর্ট ভিসা লাগে।

—বানায়ে দেব।

—যেতে হাওউই জাহাজ লাগে শুনেছি।

—তাতেই তো যাবা।

—গরিবের সঙ্গে তামাশা করছ?

—বিলকুল না। আয়েসাও তো গেল একবার।

—গরিব বাদশার বেটি তো যায়নি। গেছে আমীর হায়দারের বেগম।

—গোস্‌সা তফাত্‌ রাখ। তুমি বেগম আয়েসার আব্বাজান তো বটে। যাতায়াত হোটেল চার্জ দেব। উপরি কিছু টাকাও পাবা।

বাদশার খটকা লাগে, বেফিকিরে দেবে! ঘোরে পড়ে খুঁতখুঁতায়, আলপটকা গরিবের ওপর এত দরদি হওয়ার মতলবটা কি?

—দরদ কোন কালে ছিল না? হাড্ডি চিবিয়ে হায়দার জবাব দেয়, তবে ধান্দাতো একটা আছেই।

—সেটা খোলসা করে বল, শুনি।

—হালে মেটিয়াব্রুজে যে কারবারটা জোরদার চলছে হায়দার তার শাঁসটুকু শোনায়, করিম ইব্রাহিম সেলিম তোমার জান পহেচান আদমি। সফরে ওদের সাথ্‌ দেবা। পুঁজি আমার। আইন মাফিক তোমার নামে কিছু বিলিতি সামান আসবে। মালিকানা আমার। পারবা না?

বাদশা দোমনায় পড়ে যায়। গর্হিত কলে ফাঁসবে নাতো? হায়দারের আর কি। খেসারত বরবাদি তো তার। কিন্তু, বেখরচে ফর্‌ন ঘুরে আসতে কার না দিল টানে। কলিজা ধুকপুক করলেও বাদশা ভড়কায় না। হায়দার বরাবর হিতকারি বল ভরসা। বরাত জোরে মেলা অমিল মওকা হাতছাড়া করা হক হবে না। তাই বলে নেশার ঘোরে মত দেয় নাই। এক হপ্তা সময় চেয়ে নেয় বাদশা।

আজ রাতের আশমান যেন ফিরোজা ঢাকাই জামদানি শাড়ি। সারা গতরে সিঁতারার বুটি। চমকদার সফেদ নুরানি চাঁদ উঠেছে। বনবাদাড় মাঠঘাট ময়দান জমিনে ফকফকা চাঁদনির বান ডেকেছে। চালাঘরের চাল চাতালেও। বাতাসে ভাসছে হাস্‌নুহানা মোতিয়াবেলির খুশবু। সাঁইবাবলা আমলকির পাতায় আওয়াজ ঝিরঝির।

বাদশার চোখে নিদ আসে না। কেরোসিনের টেমিটা নিভিয়ে রোয়াকে এসে বসে। শুনশান চড়ার মতো একানে লাগে। নিজেকে পিয়াসী চাতক মালুম হয়। কলিজার গহীন থেকে আশমানে বাতাস ওঠে। আল্লাহর নাম ইয়াদ করে। খোদাকে খেদ জানায়, জান জিন্দিগি এন্তেকাল তোমার হাতে। চাঁদ সিঁতারা সূরজ খোরাকি পানিও তোমার। পরশ গোলামদের বোল অবোল কিছুতো তোমরা কাছে লুকাইয়া নাই। এমনি চাঁদনি রাতে গতরে যদি সাড়া জাগালা, বিবিকে আজ ইস্তক কেন ফেরার রাখলা? এ তোমার কি মতিমর্জি আল্লাহ।

ব্যাস্ পররোজ ফজরে বাদশা তিশরা কলে পড়ে যায়। তিন রোজ হল ইশাক গা ঢাকা দিয়েছে। রোজকার কিস্তি বকেয়া। আশি বিয়াল্লিশ অটোর মকবুল মারফত তাগাদা জানিয়েছে। তবু বদন দেখানোর গরজ নাই। তাই আঁধার থাকতে ভিটায় পাকড়াওয়ের মতলবে বেরুলো।

ইশাকদের রাস্তাটা রেললাইনের ওপারে হোগলা বন কলা বাঁশঝাড়ের ধারে। ইদিকে জঙ্গলটা জমির পর রেল লাইন। কাশ আকন্দ বাসক ধুতরার ঝোপঝাড় পার হতে গিয়ে বাদশা থমকে দাঁড়ায়। পাতলা আলোয় এক জেনানা নজরে আসে। পয়লা আমল দেয় না। ঝোপ ঝাড়ে কত মাগীই তো পাছার কাপড় তুলে টাট্টী যায়। নজরে নজর পড়লে শরমাতে পারে। তাই জোর কদমে পা চালায়।

কিছুদূর যাওয়ার পর বাদশার খটকা লাগে, ইদিকে মহল্লা কোথায়! জেনানাটাকে জান পহেচান মালুম হল না। ভাবগতিক কেমন খাপছাড়া গড়বড়ে। এখন আপট্রেন আসার টাইম। শুনশান একানে কোন বেমতলবে আছে?

ধন্দে পড়ে বাদশা ফের ফেরত আসে। বায়োস্কোপের ফাঁদ পাতা খোঁজকারীর মতো নিজেকে মাদার গাছে আড়াল করে। তফাত্ থেকে চৌকশ হুঁশিয়ার নজর রাখে।

দূর হিজল বনের দিক থেকে ট্রেনের আওয়াজ আসে। গাছগাছালির ফাঁকে বদন দেখা মেলে। আওরতটাকে লাইন বরাবর আগুতে দেখা যায়।

আন্দাজটা বিলকুল সাচ! বাদশা চনমন টগবগিয়ে ওঠে। বাগড়া দিতে হিম্মতঅলা বনে যায়। জলদি ধাওয়া করে। লাইনে গলা বসাবার কালে পিছুটান মারে। ফের তেজী দু'হাতে জাপ্টে ধরে। ভুঁই ঝাঁকিয়ে ট্রেনটা দূরে গায়েব্ হয়ে যায়। আওরতটা জাতিকলে আটক পড়ার মতো ছটফটাতে থাকে কঁকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে। ছাতিতে চোখের পানির আঁচ লাগায় বাদশা খোয়ানো তাকত ফের মালুম পায়। গতরটা চুলাই হয়ে ওঠে।

—ছোড়দে বাততামীজ। আওরতটতা বেসামাল বোল ছোটায়, বেশরম হারামি কাঁহেকা....

—চোপ। বিলকুল চোপ। বেড়ি খালাস দিয়ে বাদশা দাবড়ায়। চোখ কটমটিয়ে ফইজত করে, জান বাঁচায়ে ইনসানের কাম করলাম তো কিনা খিস্তি!

—তু দুশমন। গালি না তো ইনাম দিব? শালা হারামি...

—ফের! বাদশা হাত উঁচিয়ে জোর পেটাইয়ের ডর দেখায়। গালে হালকা চাটি মারে। হাতটানে সুমুখের গাব গাছের নীচে বসায়। চারমিনার সিগারেটের ধোঁয়া ছোঁড়ে। দরদি নরম বোলে সওয়াল রাখে, কি নাম তোমার?

—মউলি।

—বাহ্, মিঠা নাম। বাদশা ডাইনে বায়ে মাথা দোলায়। তোয়াজ করে, দেখতেও নজরদারী। গালির বদলে মিঠা বোল বলা যায় না?

শরমে মউলির মাথা ঝুঁকে পড়ে। জবাব দেয় না।

—আপনা জান খতম করতে গেছলা কেন? বাদশা ফের সওয়াল রাখে।

—বহুত দুঃখ্সে। মউলি মিনমিনায়।

—দুঃখ বিনা জিন্দেগী হয়? দুঃখ কি আমার কমতি আছে? দোশরা মরদের সাথ বিবি ভাগ্‌লবা। একটা বেটি ছিল। আমীরের বিবি বনল। ব্যাস্, গরিব বাপের পাত্তাই নেয় না। আমি বিলকুল একেলা। তো হামি আপনা জান খতম করেছি?

—আমার বাত্ আলাগ্। বাদশার বিবি নেই শুনে মউলি সহজ হয়ে ওঠে। সন্তাপি আফসানি শোনায়, শরাবী মরদ নেশা ভাঙ্ করে কুলি লাইনে সাট্টা জুয়া খেলে। চিনা গলির রান্ডীর ডেরায় রাত কাবার করে। ঘর লোটে তো আপনা বিবি বেদম লাথ্ পেটাই খায়। সাবুন কলে মজদুরি করে। তলব আচ্ছা। লেকিন ঘরকা বিবি ভুখা রহে।

—ছানাপোনা ক'টা?

—এক ভি নেহি। হোগা ক্যায়সে!

বাদশা ফের কোন সওয়ালে যায় না।

তো দরদ ঠিকদারিতে বাদশা যদি খাঁ খাঁ খুপরিতে সরাব সাট্টার ঠেকের বদলে মউলিকে আস্থান দিয়ে থাকে তাতে গলদ কোথায়? কোথায় শাবাশি দেবে তা না; তল্লাটের মহল্লায় মহল্লায় বদনামি চাউর হয়ে যায়। মহল্লা জাহান্নামে যাওয়ার রব ওঠে। জাতপাত-দাঙ্গার খতরা দেখে অনেকে।

মাথা ভারি বাদশাও টের পায়, এসব আদতে খানদান আদমিদের বুজরুকি দুশমনি। দেহাতে সবতাতেই ওদের যোলআনা মুরুব্বিআনা মাতব্বরি। ওরা ছাড়া আর কেউ যেন ধর্ম্ম দস্তুর আইন কানুন সমঝ পায় না। বিস্তর কলকারখানার মেটেব্রুজে ছোটামোটা ব্যাপারেও কলকারসাজি। আদতে পাটের পাটোয়ারি পাঁচু কাশ্যপি টুকরা পট্টির ব্যাপারি সবুর মিঞা আর খুন খারাবির ওস্তাদ আজাহারের গ্যারাকল। ঘোঁট পাকাতে চায় পিস্ কমিটির মদন মুখুজ্যি। সেলাই ফোঁড়াইয়ের কেরামতি জানা নসীব আলীর উস্কানিও আছে। তল্লাটের বদনসিবি আওরতদের মুশকিল আসানের ওরাই যেন ইজারদার। এইসব মাতব্বর মহাজনদের মাঝে হামেহাল কাজিয়া কোন্দল আঁকশা আঁকশি বিরোধ। ফের যেহেতু মউলি খুতো গরিব বাদশার হেফাজতে আছে, বেবাক মিঞা মিলি ঝুলি এককাট্টা।

ওরা কোশিসে কসুর করে নাই। খবর আছে, ফেলু সর্দারকে পাকড়াও করে হরেক রকমে সমঝাতে চেয়েছে। সেই সরাবি রান্ডীবাজের এক বোল, মউলি বাঁজা খানকি বেদরদি বেইমান। এ্যাখুন তো বেজাত-মোসলমান।

মউলিকে ওয়াপস্ নিতে চায় না ফেলু। রেওয়াজ মাফিক শাদী হয়নি দুজনায় ব্যাস্ সে যেন এখন বেওয়ারিশ মাল। হররোজ হরেক মতলাবি দাবিদারদের হাজির দেখা যাচ্ছে। আজ দুপুরে ইটভাটার মালিক ঢেমনা বিষ্টুপালের তহশিলদার এসেছিল। ফালতু সাত পাঁচ ধানাই পানাই পর উমেদারি করে, বিষ্টুবাবুর বিবি কঠিন ব্যারামে কমজোরি। ঘরের কাজকামে মউলির মতো হাঘরের নিয়োগ জরুরি। কত দিলে ছাড়বা?

শুনে বাদশার গতরে বিছুটি পাতার শূলানি শুরু হয়ে যায়। নাখোশ নাজবাব আতুর চোখে তাকায়। মউলি তেরিমেরি সুমুখে দাঁড়ায়। বঁটি হাতে চোখ পাকায়। মারমুখো রোখা বাত শোনায়, ইটাকি কুলি লাইন না চিনাগলি যে তোর মালিক টাকার লালস লাগায়ে আওরত খরিদ মাঙছে? ফের বাত্ বলবিতো কাটাই করব তোর...

চাচা আপনা জান বাঁচা। তহশিলদারের আক্কেল গুড়ুম। বেগতিক ডরে তরাসে দে ছুট্।

সাঁঝে রোয়াকে বসে কেরোসিন আলোয় কাপড়ের ওপর ফুটা ফুটা নকশা আঁকা কাগজ পেতে ছাপ তুলছে বাদশা। মউলি সলমা সেলাই করছে। আলটপকা হায়দার হাজির। কাপড়ের আঁচলে বদন আড়াল করে মউলি ঘরে ছুটে যায়।

বহুত্ রোজ পর। হায়দারকে খাতির করে বাদশা পাশে বসায়।

বাংলাদেশে থাকার দরুণ আসতে লেট হল জানায় হায়দার। মহল্লায় মহল্লায় গরম হালচালের খবর শোনায়। গার্জেন ঢঙে ফইজত করে, খামোকা বেআক্কেলে কাম করতে গেলা কেন?

—কোনটা জানে বাঁচান?

—না। সেটা না করলে কাফেরি হতো।

—গলদ কোন্‌টা? বাদশা ভিরকুটা ভঙ্গি করে, ঘরে আস্থান দিলাম কেন?

—হাঁ।

—বিলকুল বেসাহারাকে আস্থান দেয়ায় আল্লাহ্ গুনাহ্ ধরবে না। কানুন তোমায় বেকায়দায় ফেলতে পারে।

—কোন দফায়? হাবাগবা বাদশা পোক্ত বোলচাল শোনায়, ফুসলাইয়া আনছি নাকি? বিবি বেগমও বানাই নাই। ওর মরদ ওয়াপস্ নিতে নারাজ। আইনের খাতায় গর্হিত করলাম কোথায়?

—তুমি মোসলমান। আওরতটা হিঁদু। সেটা বিচার করবা তো?

আপদকালে হিতকামে দরদ রহমত ইশকে কিসের এত বাছবিচার! সত্যপীরের দরগায় শোনা এক দরবেশের বয়ান বাদশা ছাতি চিতিয়ে শোনায়, আদি আদতে জাত চিল একটাই। পরে ইনসানেরা হরেক দিন আমদানি করেন। তাতেই ভেদ বিবাদ অবনিবনা কায়েম হয়।

—ওসব কেতাবি বাত্ ক'জনায় মানবে? হায়দার দোহাই পাড়ে, নবাবের আমল থেকে আজ ইস্তক মেটিয়াব্রুজে হিঁদু মোসলমানে আপোশ সমঝোতায় মিলমিশ বসবাস। তোমার বেয়াড়া বেয়াকুবিতে মারদাঙ্গা লাগার জোগাড়। নিজেও হালগতিক আঁচ পাচ্ছ। ফের পরোয়া না করবা তো পস্তাবা।

—তোমার বিহিত সলাটা কি তা শোনাও দেখি। যোগসাজশ আন্দাজ করে বাদশা জানতে চায়।

—আমার একার সলা কি আর শুনবা? তামাম মহল্লার একজোট বিচার, জিম্মায় রাখা আওরতটাকে খালাস দিলেই বিলকুল পিসফুল।

—খালাসের পর ফের লাইনে যাবে। তখন?

—তা হবে না। হায়দার খোলামেলা হেতু শোনায়, নসীব আলী হালে কাপড়ে জরির কাজের কারবার খুলছে। আমেদাবাদ জয়পুর আরবে মাল পাঠায়। আওরতটার হাতে ঘাঘরা দোপাট্টায় জরির নকশার কাজ আছে। নসীব ওকে কাজ কাম দিয়া রাখতে রাজি।

—নসীব মোসলমান না?

—সিমেন্টকল, সুতাকল, সাবুনকলের হিন্দু বাবুরাও ঘরের কাজকামে ওকে হোলটাইমার চায়। যা তোমার মর্জি। চাহিদা যখন এত আমার সলা শোন; মুফতে ছাড়বা না। বেয়াত দিতে কলে ফেলে আচ্চা কিস্মত বাগাবা।

কিস্মত, কিস্মত, কিস্মত! বাদশার পোড় লাগে। দাপটে রোখা জবাব দেয়, সক্কলে লালস দেখায়। গরিব আদমিরা কি কুত্তা? তাদের দিল্ থাকতে নাই?

—নিজের বেটির বেলায় তো দিল দেখাও নাই। বাদশার চোটপাট বেতোয়াক্কা মেজাজে হায়দার লাগসই ঘা মারে। পাল্টা মেজাজ চড়ায়, তোমারে সমঝায় কোন মোল্লা। আখরি বাত্ শোন বেয়াকুব মিঞা। গোয়ার্তুমিতে দুশমন হি দুশমন বাড়াবা। বরাবর মুশকিল আসানে এক তরফা হায়দারের মদত পাবা, তা হয় না। এখন থিকা তোমার ধকল তুমিই সামলাবা। আমি চল্লাম।

বেঘোর বিপাকে কাহিল বাদশা ছাতির ওপর দু'হাত রাখে। অবোল একানে বসে থাকে। কেরোসিনের রোগা আলোয় তরতাজা মউলি সুমুখে হাজির হয়। পাছা কোমর ছাতির গাঁথুনি নজরদারি। মাথায় এক থোপনা কুঁচকুঁচা চুল। ডাগর ডাগর চোখ। আটসাট ডগমগা আলগা চটকদারি গতর।

মউলির এত চাহিদা কেন, বাদশা সমঝ্ পায়। ধন্দে পড়ে, মদিনা ভাগল কেন? মউলি থাকতে চায় কোন মতলবে?

—তু না বাদশা? মউলি সন্তাপি বাদশার গতর ঘেঁষে বসে। সাচ্চাই কাজকামে পরবশি মদতের জবান রাখে। মাতায়ে চাঙ্গা চনমনা করতে চায়, নবাব বাদশাদের হিন্দু বিবি থাকত। এ্যাখুন ভি হিন্দু মুসলমানে শাদী হয়। ফের কাহে খানেজাদি আমাকে বেচতে ধান্দা! তু কি কশাই?

কশাই! টাকার লালসে জবাই দেয়া বেটি আয়েসাকে বাদশার ইয়াদ আসে। খবর আছে, চোরাই চালানের কারবারে ধরপাকড় হুজ্জতি রুখতে পুলিশ মাতব্বর মহলে খুবসুরতি আয়েসাকে হায়দার নজরানা পাঠায়। সে বেটির পেটে হায়দারের আউলাদ অসম্ভব।

আনচান আফসানিতে বাদশার মাথা ঝুঁকে পড়ে। তকলিফ সন্তাপে ছাতি ফাটার হাল। চোখের কোনে পাণি পিট পিট করে। মউলিকে বেমতলবি মাতব্বর হিতকারির কলে ঠেলতে মন সরে না। কলিজায় তাকত দেখাতে আল্লাহর নামে নিজেই কলে পড়ে যায়।

দাউদ আলীর দায়াদের খুনেও সেলাই ফোঁড়াইয়ের কেরদানি। গরিবের ছেঁড়াকাঁথা গেরস্থালি নকশিকাঁথা হয়ে ওঠে। বছর উত্‌রায়। কোথায় দুশমনি দাঙ্গা? মউলির কোলে ফুটফুটা আউলাদের ফিক ফিক হাসি দেখে বাদশা ফেরেশতা ঠাওরায়। হররোজ চালাঘরের চবুতরে গোবর ছটা পড়ে। সবের সাঁঝে আজান শোনা যায়। ফের সেঁজবাতি জ্বলে, শাঁখ বাঁজে। অযোধ্যার নবাবের মেটিয়াব্রুজকে বাদশার অযোধ্যা মালুম হয়।